প্রথম অধ্যায়

অমিয়ভূষণ মজুমদার-এর উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজ

উত্তরবাংলায় সারা জীবন বসবাস করে, এখানে বসে লিখেই বাংলা উপন্যাসের বিস্তৃত ভূখন্ডে স্বমহিমায় নিজের স্থান করে নেবার অনন্য কৃতিত্ব একজনেরই। তিনি অমিয়ভূষণ মজুমদার। উত্তরবঙ্গে বসবাসের অভিজ্ঞতা, এখানকার জীবনযাপন অবধারিতভাবে তাঁর কথাসাহিত্যে ছাপ ফেলেছে। ১৯১৮ সালের ২২শে মার্চ তিনি কোচবিহার শহরেই মাতুলালয়ে জন্মান। তখন দেশীয় রাজ্যের রাজধানী কোচবিহার বেশ আধুনিক শহর। দেশীয় রাজাদের ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডনের সঙ্গে যোগ। কোচবিহার শহরের তুলনায় অমিয়ভূষণের পৈতৃক বাসস্থান পাবনা জেলার পাকুড়িয়া পদ্মাপারের নিতান্ত একটি গ্রাম মাত্র। এই গ্রামের বাড়িতে তাঁর শৈশবের প্রথম সাত বছর কেটেছে। অমিয়ভূষণের বাবার ঠাকুরদা একটি পুরানো নীলকুঠি কিনে সেটিকে বাসস্থান করে নিয়েছিলেন। সেখানকার বড় বড় ঘর। বাড়ির মধ্যে হারিয়ে যাবার মতো বাগান পুকুর - এসবের মধ্যে তাঁর জীবনের প্রথম শৈশব কেটেছে। পুরানো দিনের জীবনের প্রতি তাঁর আকর্ষণের একটা সূত্র এই শৈশবের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। অমিয়ভূষণের নিজের কথায় -

> ''আমার শৈশবের চোখে নীলকুঠির সেই দুর্গাকার বিস্তৃতি ও গড়ন, আধ ইঞ্চি পুরু লোহার পাতের দশ এগারো ফুট দরজাগুলো, এক-বুক উঁচু বাঁধানো নীল চৌবাচ্চার দেয়ালগুলো যার উপরে আরো ফুট পাঁচেক গেঁথে তুললেই অনায়াসে হলঘর শোবার ঘর ইত্যাদি করা যায়, আর তা না করলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের খুঁড়ে বার করা পরিচ্ছন্ন ধ্বংসাবশেষের সাজানো-গোছানো এক্‌জিবিট্ যার ফলে দুর্গর কল্পনাটাই বাড়ে; পুরনো দু-একটা তরোয়াল, ঢাল; ঢোলকাকার ঢাকাকার, প্রকান্ড কবরীফুলের আকার কাচের চিমনিগুলো, দু তিন কেজি তেল ধরে এসব প্রকান্ড হিংকসের হারিকেন লণ্ঠন - এ সবই অবাক হওয়ার মতো বোধ হতো।''[১]

এই পুরানো বাড়িতে শৈশবের স্মৃতি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে বহুবছর পরে 'নিজের

কথা' বলতে গিয়ে অমিয়ভূষণ তাকে ভুলতে পারেননি। নিজেই বলেছেন নীল ভুঁইয়া, রাজনগর, গড় শ্রীখন্ড ওই বাড়িটার সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত ।

> ''কোচবিহার উত্তরবঙ্গের এক প্রান্তে অবস্থিত হলেও সে সময়কার বাংলাদেশে তার একটা আলাদা গুরুত্ব ছিল। কোচ রাজাদের শাসনকালে এখানকার ধর্ম, লোকসংস্কৃতি, শিল্পকলা, শিক্ষার বিকাশ প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রভূত উন্নতি সাধন হয়েছিল। ভাবতে অবাক লাগে যে, সেই মধ্যযুগের যখন বাংলা লোকভাষা বলে শিক্ষিত জন দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছিল তখন কোচবিহার রাজবংশের উৎসাহে ও উদ্দীপনায় বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা ও রাজকার্য পরিচালনা করা হত। মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের সময় থেকেই জেনকিন্স হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আধুনিক শিক্ষার প্রসার শুরু হয়েছিল বলা যায়। ১৮৮৮ খ্রীঃ মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের প্রচেষ্টায় ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপিত হয়। এছাড়া ১৮৮১ সালে নারী শিক্ষার জন্য সুনীতি একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেছেন। জীবনযাপনের আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াটি এই শহরে কারো মুখাপেক্ষি না থেকে রাজাদের মুক্ত চিন্তার ফলস্বরূপ অনেক আগেই এসে হাজির হয়েছে। প্রায় আধুনিক এই শহর জীবন অমিয়ভূষণের জীবনে দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে এসেছে।
>
> ''এই কোচবিহার শহর অমিয়ভূষণকে একেবারে অনাস্বাদিত এক আনন্দের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল। শহরের আধুনিকতা, অনেক মানুষের এক বুক ভালবাসা আর ইঁট কাঠের রূপের ফাঁদে প্রথম দিন থেকে সেই যে জড়িয়ে পড়লেন সারাজীবন তাতেই আকণ্ঠ মজে রইলেন।''[২]

অমিয়ভূষণের উপর যেমন তাঁর পৈতৃক বাসস্থানের একটা প্রভাব ছিল, তেমনি কোচবিহার শহরও তাঁর জীবন ও রচনাবলীর সঙ্গে জল হাওয়ার মতো জড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজে লিখেছেন নীলকুঠির বিত্তহীন বনেদিয়ানার চাইতে নিম্ন মধ্যবিত্তের আধুনিকতা পছন্দ করে নিয়েছিলেন। তখনকার কোচবিহার ছিল একটি আধুনিক নগর। রাজাদের সঙ্গে লন্ডনের যোগ। এই শহরে এসে জেনকিন্স স্কুলে ভর্ত্তি হওয়াটাকে তিনি তাঁর জীবনের সব চাইতে বড়ো ঘটনাগুলোর একটা বলে মনে করেছেন। 'লাল নক্ষত্র' আশ্বিন-১৩৯৩ সংখ্যায় অমিয়ভূষণ মজুমদার বলেছেন ঃ

''আমি যা অনুভব করতাম তা সুখ। তার কারণ আমার কাছে তখন দাদামশায়, দিদিমা এবং মামার ভালবাসা, স্কুলের বন্ধুবান্ধবদের ভালবাসা আর যেন চারিদিকের রঙিন আলো আলো ভাব। এখন ভাষা দিতে পারি আমার সেই অব্যক্ত প্রীতির, তাই বলতে পারি এখন শহরের আধুনিকতা, আমার দাদামশায় আর মামা দু'জনেই উকিল যা জমি জিরাত খাজনা আদায়ের তুলনায় আধুনিক। যাদের কাছে সময়ের দাম ছিল, বাড়ির সকলের বই পড়া, কাগজের খবর রাখা, আদালত কোর্ট, সরকারি অফিস, রেল স্টেশন, হাটবাজার, স্কুল-কলেজ, ব্রাহ্মমন্দির, পথে ব্যস্ত সমস্ত মানুষের যাতায়াত, ঘোড়ার ক্বচিৎ মোটরগাড়ি, বড় বড় সুন্দর ঘোড়া, হাওদাদার হাতি, রাজবাড়ির মারফৎ লন্ডনের হালচালের গল্প ছড়িয়ে পড়া, দিদিমার বইপড়া, বই লেখা, সভাসমিতি করা, ব্রাহ্মমন্দিরের যাওয়া, তাবিজ-কবজ-মানত না মানা, ঈশ্বর আছেন কিংবা নেই, থাকলে তার চেহারা আছে কিনা এইসব আলাপ, মামার সঙ্গে বসে গান শেখা, অতুলপ্রসাদ ডি এল রায়ের গান, আর স্কুল-কলেজ বেলা দশটায় ছাত্রছাত্রীতে পথঘাট ভরে যাওয়া, আর ক্রিকেট টেনিস, আর এইসব আধুনিকতার সঙ্গে যা চোখে লেগেছিল তা সৌন্দর্যরূপ। সোজা সোজা প্ল্যান করে পাতা লাল সুরকির পথ যার দু-পাশে বড় বড় গাছ পথগুলোকে বীথি করে রেখেছে। সেই যে সে রূপের ফাঁদে পড়া তার থেকে আর মুক্তি নেই।''[৩]

অমিয়ভূষণকে মুগ্ধ করেছিল কোচবিহারের শহরের আধুনিকতা আর মামাবাড়ির জীবিকা ও জীবন পরিবেশ। এই জীবন পরিবেশ তাঁকে সুখী করেছিল। এই শহরের রূপকে তিনি বিশেষভাবে অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাই সে রূপের ফাঁদ থেকে মুক্তি চাননি। সারা জীবন কোচবিহারে কাটিয়েছেন - যখন কলকাতায় পড়াশোনা করতে আসতে হল তখনো কলকাতার আকাশটা তাঁকে আটকে রাখতে পারল না। তিন চার মাসের মধ্যেই কোচবিহারে ফিরে গেলেন। আর যখন পোস্ট অফিসের চাকরির জন্য কোচবিহার ছেড়ে বাইরে যেতে হল তখন সেই শহরবাসের অভাবজনিত শূন্যতাবোধ থেকেই তাঁর লেখার হাতেখড়ি। তিনি লিখেছেন লেখা তাঁকে আমিত্বের স্বাদ এনে দিত।

১৯২৯ সালে পাবনা থেকে বাবা-মা ও পরিবারের অন্য সবাই কোচবিহারে

চলে আসায় অমিয়ভূষণের ভাললাগার ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত হল। কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুলে পড়াকালীন তাঁর মধ্যে সাহিত্যবোধ তৈরি হতে লাগল। এক্ষেত্রে শিক্ষক ঊষা কুমার দাস-এর ভূমিকা অনেকখানি। তাঁর প্রেরণাতে চলছিল সাহিত্যপাঠ।

ঊষাবাবুর সাহিত্যপ্রীতি অমিয়ভূষণের সাহিত্য পটভূমি তৈরি করেছে জেনকিন্স স্কুলে পড়ার সময় তিনি 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' বইটি পড়েন। তখন তিনি সেই অতীতে পরিবেশের মধ্যে রামমোহন রায়-রামতনু লাহিড়ী প্রমুখের কালে যেন বাস করছিলেন।

> ''আমার মন যেন বাঙালি হওয়ার জন্য বাঙালির সেই জন্মমুহূর্তে ভূমিষ্ঠ হতে চাইছিল।''[৪]

ঊষা কুমার দাস-এর অনুপ্রেরণা কাজ করেছিল; কিন্তু মাস্টার মশাই নিবারণবাবুর কাছে ইংরেজি কবিতার সৌন্দর্য উপভোগের দীক্ষা হয়েছিল। স্কুলের গন্ডী অতিক্রম করে অমিয়ভূষণ পৌঁছলেন কলেজ জীবনে। কোচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজে আই.এ পড়তে ভর্তি হলেন। ১৯৩৫ সালেই টাইফয়েডের কবলে পড়ে আই.এ পরীক্ষা দেওয়া হল না, তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গিয়েছিল, স্বাস্থ্য ফেরাতে গেলেন তিস্তা নদীর ধারে কুড়ি গ্রামে দিদির বাড়িতে। তিস্তা নদীর জলের উপরের বাতাস নরম একরাশ সতেজতা ছড়িয়ে দিল তাঁর চেহারায়। সেখানে এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ভদ্রমহিলা এবং তাঁর স্বামী দু'জনেই বেহালা বাজাতেন। ভদ্রমহিলা তাঁকে দুটি বই পড়তে দিলেন - ব্যাবিট ও বাডেন ব্রুকস। এই বইদুটো অমিয়ভূষণের জীবনে প্রথম উপন্যাস হয়ে এসেছিল। এক নতুন উপলব্ধির স্বাদ বয়ে নিয়ে তিনি ফিরে এলেন কোচবিহারে। তাই বছরটি তাঁর কাছে মূল্যবান। এর মধ্যে শুরু হল কলেজে যাওয়া। অবসর সময়ে মোপাসাঁ, চেখবের ইংরেজি অনুবাদ পড়ে সাহিত্যের রূপ সম্বন্ধে তিনি সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হল প্রমথেশ বড়ুয়ার 'দেবদাস' ছবি থেকে। কলেজে পড়ার সময় হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, কলেজ ম্যাগাজিনে গল্প লিখেছেন।

আই.এ পাশ করবার পর তিনি কোথায় পড়বেন সেটা নিয়ে একটু ভাবনা দেখা দিল। প্রধানত দুটো কারণে তিনি কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি

হলেন। প্রথমত কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের পঠন পাঠনের মান তখন নিম্নমুখী। দ্বিতীয় কারণ পরীক্ষার ফল ভাল করা। তাঁর বাবার মনে হয়েছিল পরীক্ষার ফল ভাল না হলে ভাল চাকরি হয় না। আর ফল ভাল করার জন্য এমন জায়গায় পড়া দরকার যেখানে পরীক্ষার উপযোগী শিক্ষা লাভ করা যায়।

> ''লেখাপড়ার ব্যাপারে এই Inportant পড়ার চেষ্টায় আমি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম।''[৫]

স্কটিশ চার্চ কলেজে এই Inportant প্রশ্ন বেছে পড়ার সুবিধে হবে ভেবে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন। কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের একজন অধ্যাপক তাঁকে স্পষ্ট বলেছিলেন -

> ''তাঁরা অনার্সের পেপার সেটার নন, একজামিনার নন, পরীক্ষার ভাল ফল করতে যে বাছকোছ করে পড়া দরকার সে বিষয়ে গাইড করতে পারবেন না।''[৬]

কিন্তু কয়েক মাস পরে তিনি কলকাতা ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হলেন। কলকাতায় হ্যারিসন রোডের এক মেসে থেকে তিনি পড়াশোনাকরছিলেন। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন ঃ

> ''আমার স্বাস্থ্য খারাপ নয়, ওষুধপত্র ধরে বাঁচি না।''[৭]

তা সত্ত্বেও কলকাতায় তিন চার মাস থাকার পর কোচবিহারে ফিরে এলেন।

> ''সানস্ট্রোক হতে পারে, মেনিনজাইটিস হতে পারে, মাথার কষ্ট সমেত ইনফ্লুয়েঞ্জা হলেই বা কী দোষ? back to pavilion''[৮]

পরবর্তী কালে তিনি বলেছেন - 'সেই রাজনর্তকী দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হলাম।' ১৯৩৭-এর কলকাতা রূপের ঐতিহ্যে নর্তকীর মতোই প্রতিভাত হয়েছিল তাঁর কাছে। কিন্তু কলকাতা সম্পর্কে পরবর্তীকালেও কোন মোহ দেখা যায়নি। সারা জীবন কোচবিহারে কাটিয়েছেন কলকাতায় বাস করবার কথা মনে আসেনি। বরং কলকাতা সম্বন্ধে একটা critical mind কাজ করেছে। কলকাতা থেকে ফিরে কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজেই ইংরেজি অনার্স নিয়ে ভর্তি হলেন। কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল ও ইংরেজি বিভাগের প্রধান শরৎচন্দ্র গুপ্ত অমিয়ভূষণের পাঠ স্পৃহা দেখে তাঁকে ইংরেজি সাহিত্যের রসসমুদ্রের সন্ধান দিলেন। তিনি লাইব্রেরী থেকে

299656
11 DEC 2017
LIBRARY

কতকগুলো বই বেছে একটা আলমারিতে ভরে তার চাবিটা অমিয়ভূষণের হাতে তুলে দিলেন। তাঁকে যেন সাহিত্যপাঠের নেশায় পেয়ে বসল। তিনি ইংরেজি সাহিত্য নামে সমুদ্রে বালতি ডোবাতে শুরু করলেন। এর ফলে যা হবার হল, অনার্স পেলেন কিন্তু পরীক্ষায় ফল খুব একটা ভাল হল না। এদিকে তখন দেশের অর্থনীতিতে মন্দা লেগেছে। ১৯৩৮-৩৯-এর সেই সর্বব্যাপী রিসেশন তখন অর্থনীতিকে গ্রাস করেছে। তাঁর বাবা অনন্তভূষণের কোচবিহারে থাকা বেশ কষ্টকর হয়ে উঠছিল। কোচবিহারের যে ব্যাঙ্কে তিনি কাজ করতেন সেই ব্যাঙ্ক শুধু তাঁকে অর্ধেক বেতন দিয়ে ব্যাঙ্কটাকেই গুটিয়ে নিতে সচেষ্ট হল। এদিকে তখনও অমিয়ভূষণের ছোট ভাইদের কলেজে পড়া বাকি। অমিয়ভূষণ লিখেছেন বি.এ পড়া শেষ হওয়ার আগেই এই পৃথিবীকে চিনতে চেষ্টা করছিলেন। তখনো পোস্ট অফিসের চাকরিতে কাস্ট হিন্দুর ঢোকা একটু সহজ ছিল। বি.এ পড়া শেষ করে পোস্ট অফিসের চাকরির একটা পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ফলে বি.এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোতে না বেরোতেই ডাকঘরের চাকরি পেয়ে গেলেন। আদৌ বেকার হতে হল না। প্রথম পোস্টিং হল রাজশাহীতে এক গ্রামের ডাকঘরে। তাঁর মামা সেখানে তাঁকে পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন। অমিয়ভূষণ তখনকার পরিস্থিতিতে চাকরি পাবার সমস্যার কথা লিখেছেন ঃ

> ''আমরা যেহেতু কাস্ট হিন্দু চাকরিতে ঢোকা দুঃসাধ্য ব্যাপার।''[৯]

অমিয়ভূষণ আরো লিখেছেন ঃ

> ''এই চাকরির ব্যাপারে একটা কথা বলা দরকার, খুব সামান্য চাকরি, পোস্ট অফিসে কেরাণির। কিন্তু চাকরিতে পৌঁছে দিতে রাজশাহী জেলার সেই গ্রামে আমার সঙ্গে আমার মামা গিয়েছিলেন। এটা বলা দরকার অ্যাডভোকেট হিসাবে তাঁর আয় আমার বেতনের চল্লিশ গুণ হবেই। এটা একটা প্রমাণ আমার মামার ভালবাসারও, তৎকালীন আমাদের পারিবারিক আদর্শেরও। মামা যেন এই ঘোষণা করেছিলেন আর্থিক সঙ্গতি দিয়ে মানুষের বিচার হয় না। চাকরিটা করবে বটে কিন্তু মানুষ হিসাবে তোমার দাম কমছে না।''[১০]

চাকরির সূত্রে তিনি বেশির ভাগ সময়টাই উত্তরবঙ্গের নানা জায়গায় ঘুরেছেন।

> ''চাকরির গোড়ায় রাজশাহী শহর ও পাবনা জেলায় ঘুরতাম। রবীন্দ্রনাথের শাজাদপুর আর নিজেদের গাঁয়ের রেলস্টেশন পাকসির রেল কলোনিতে

সে-সময়কার বেশির ভাগ কেটেছে।"[১১]

এর মধ্যে তাঁর বাবা তাঁদের পৈতৃক ভবনে ফিরে এসেছেন। প্রাইভেট ব্যাঙ্কের চাকরির মাইনে কমতে কমতে এমন জায়গায় এসেছে যেখানে চাকরির মোহ প্রায় কিছুই ছিল না। অমিয়ভূষণ তখন বাবার কাছাকাছি থাকার জন্য পাকসি রেল কলোনির পোস্ট অফিসে বদলি হয়ে গেছেন। তাঁর পাকসির বাসা থেকে পৈতৃক পাকুড়িয়ার বাড়ি মাইল তিনেকের মতো।

অমিয়ভূষণের দেওয়া বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় ফিউডাল ধাঁচের জীবনযাত্রার থেকে পরিবর্তিত যে আধুনিক জীবনের ধরণধারণ তাঁর অধিক পছন্দের ছিল। 'নিজের কথা'য় কোচবিহারে মামাবাড়ির জীবিকা জীবন প্রণালী পরিবেশ সব কিছুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তিনি। তুলনায় তাঁর বাবা বরং জমিজিরেত নিয়ে ফিউডাল ধাঁচের জীবনে স্বচ্ছন্দ ছিলেন। কোচবিহারের জীবনযাপন সম্বন্ধে, শহরের আধুনিক রীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে, নাগরিক রুচি সম্বন্ধে তিনি তাঁর আনন্দিত সমর্থণ জ্ঞাপন করেছেন। এই পরিবেশ তাঁকে সুখ এনে দিয়েছিল। কোচবিহার শহরের রূপের ফাঁদে পড়েছিলেন তিনি। হয়তো এই ছিল নিয়তি। তাই কলকাতায় তিনি ফিরতে পারেননি। পরেও কলকাতার ঔপনিবেশিক জীবনপ্রথা সম্বন্ধে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু এই কোচবিহার শহর তাঁকে ছাড়তে হল। চাকরি পেয়ে রাজশাহী-পাবনা জেলার নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হল। বেকার থাকেননি। চাকরি পাবার এক বছরের মধ্যে ষোড়শী স্ত্রীরত্ন লাভ করেছেন। কিন্তু কোচবিহারের জীবন তিনি ভুলতে পারছিলেন না। কোচবিহারের সেই মুক্ত স্বাধীন পরিবেশ যা তাঁর যুবক মনকে মাতিয়ে রেখেছিল, ইংরেজি সাহিত্যের মুক্ত জীবনাঙ্গনে যে মানুষটির মন স্বেচ্ছা বিহারের আনন্দ পেয়েছিল চাকরির ফলে সেই মুক্ত জীবন থেকেই তাঁকে সরে যেতে হয়েছিল। একে পোস্ট অফিসের কেরানির চাকরি - তার উপর নগর-জীবনের মুক্ত পরিবেশের অভাব - এ দুয়ে মিলে তাঁকে কিছুটা মানসিক কষ্টে ফেলেছিল। কোচবিহারে যা ছিল না - এখানে তাই দেখলেন। এখানে চাকরির অর্থমূল্য দিয়ে মানুষের মর্যাদার পরিমাপ হয় - চাকরি বড় হলে টাকা বেশি - সুতরাং সে বড় মানুষ। ফলে একটা তাঁর মনে দেখা দিয়েছিল। অমিয়ভূষণকে চাকরির জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর মামা। অমিয়ভূষণ

লিখেছেন তা দিয়ে বোঝানো যায় আর্থিক সঙ্গতি দিয়ে মানুষের পরিমাপ হয় না। কিন্তু সে কথা লোকে বোঝে না। কাজেই কোচবিহারে যে অপরিসীম সুখ অনুভব করেছিলেন এখানে তা পেলেন না। তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন ঃ

"আমি সুখী হতে পারছিলাম না।"[১২]

ছিলেন আকাশের পাখি এখন বসেছেন ঘেরাটোপের খাঁচায়। ফলে একটা নিঃসঙ্গতা তখনই তাঁর মনকে ঘিরে ধরে।

পোস্ট অফিসের চাকরির বেমানান পরিবেশ আর নিঃসীম একাকীত্ব অমিয়ভুষণকে কালিকলমের দিকে বেশি করে টেনে নিয়ে যায়। কাগজ কলম নিয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যার দিকে লেখার টেবিলে বসা অভ্যাস করছিলেন। তাঁর কথায় ঃ

"লেখা আত্মস্থ হওয়ার স্বাদ দেয়, একটা ভরশূন্য অবস্থায় অন্য রকমের আলোয় চোখ মেলা যায়, আমার সেই কোচবিহারের আমিত্বে থাকা যায়, এইভাবে টাকার অঙ্ক দিয়ে মানুষকে মাপার পৃথিবীকে অস্বীকার করতে আমার সেই অভাববোধহীন আমি দুটো কাজ করে বসেছিল - কাগজ কলম নিয়ে বসা আর ট্রেড ইউনিয়ন করা।"[১৩]

কোচবিহারে যখন থাকছেন না তখনো মনে মনে কোচবিহারে বাস করার একটা রাস্তা লেখার মধ্যে ঢুকে থাকা। কাজেই লেখাটাও তাঁর সেই যৌবনের কোচবিহারে থাকার একটা উপায়।

তাছাড়া টাকার অঙ্কে পোস্ট অফিসের স্থান খুব উপরে নয়। নিজের মনের চাহিদা না থাকলেও বাইরের লোকের কথা বড় আহত করে। কাজেই টাকার অঙ্কে ছোট হলেও মানুষের মূল্য যে কম হয় না - তারও একটা সুযোগ এই লেখার মধ্য দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। অমিয়ভূষণ এজন্যও কালিকলমকে অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর নিজের কথায় এর সমর্থন আছে। টাকার অঙ্কে মানুষকে মাপার পৃথিবীকে অস্বীকার করা হল লেখকের ভাবাদর্শের দিক থেকে মানুষের মূল্যকে বড় করে তোলা। এটা যেমন একটা দিক তেমনি মনে মনে কোচবিহারের আবহাওয়ায় বা পরিমন্ডলে বাস করা এটাও তাঁর একটা ঘোষিত উদ্দেশ্য। আমরা দেখতে পাই লেখক যেমন কোচবিহার প্রীতির কথা বার বার বলেছেন তেমনি কোচবিহারের পরিমন্ডল তাঁর লেখায় বহুভাবে উঠে এসেছে। 'গড় শ্রীখন্ড' বা 'নীল ভুঁইঞা' তাঁর

পৈতৃক বাসভবনের পরিবেশকে তুলে আনলেও পরবর্তী লেখাগুলির পরিমন্ডল কোচবিহার কেন্দ্রিক উত্তরবাংলা।

কোচবিহার তাঁর প্রিয় বিচরণের ঠিকানা। উত্তরবঙ্গও তাই। এক গভীরতর আকর্ষণ এই জনপদের প্রতি। তিনি বলেছেন ঃ

> ''উত্তরবঙ্গের উত্তরখন্ডে আমার বাস। কোচবিহারপ্রীতির কথা আগেই জানিয়েছি। এই টেমপারেট জোন-এর সুন্দর শহর যাকে আমরা স্বাধীনতা প্রাপ্তির ত্রিশ বছরে নোংরা আর ঘিঞ্জি করে ফেললেও যথেষ্ট খারাপ করতে পারিনি। এই টেমপারেট জোন-এর সুখ-সুবিধা আরাম উত্তরবঙ্গের প্রতি পক্ষপাত করেছে।''[১৪]

> ''শুধুমাত্র পদ্মা পার বা কোচবিহার নয়, উত্তরবঙ্গে বিস্তীর্ণ ভূভাগ ও জনজীবন নিয়েই অমিয়ভূষণের কথাসাহিত্যের প্লট গড়ে উঠেছে। আর এই জন্যই কেউ কেউ অমিয়ভূষণের উপন্যাসকে আঞ্চলিক অভিধায় অভিহিত করেছেন। কিন্তু এভাবে ভাবা ঠিক হবে না, কেননা সামন্ত আবহের মধ্যে বড় হয়ে উঠলেও অমিয়ভূষণ লোকজীবনের সত্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছেছিলেন। কোচবিহার দেশীয় রাজ্য ও সামন্ত প্রবাহ অমিয়ভূষণকে সমৃদ্ধ করেছিল, আর তিনি তা পেরেছিলেন বলেই মহিষকুড়ার উপকথা, মধু সাধু খাঁ, চাঁদবেনে-তে আঞ্চলিক কণ্ঠস্বর মুখ্য হয়েও তার আবেদন হয়ে ওঠে সার্বিক।''[১৫]

অমিয়ভূষণ নিজে বলেন ঃ

> ''আমার লেখার সঙ্গে যারা পরিচিত তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন আমি রাজা রানী, জমিদার, জোতদার, মধ্যবিত্ত, প্রলেতারিয়েত, লুম্পেন প্রলেতারিয়েত কারো কথাই অবহেলা করিনি। গোটা সমাজের সকলের কথাই বলেছি। সমান সহানুভূতি দিয়ে সকলের সমস্যা বলতে চেষ্টা করেছি, আমি লোকের কথা বলতে চেয়েছি অঞ্চলের কথা নয়, মানুষের কথা বলতে গেলে তাকে মাটিতে দাঁড় করাতে হয়, মাথার উপরে আকাশ দিতে হয়। আবহাওয়া, গাছগাছড়া দিতে হয়, এসব করতে নিজের চোখে দেখা মাটি, আকাশ, জল, গাছ আঁকা যত সহজ, অন্যের মুখে অপরিচিত সে সবের কথা শুনে সে আঁকা ততটা ভাল হয় না। সেজন্যেই হয়তো পদ্মা থেকে শুরু করে কাঞ্চনজঙ্ঘা এই ভূ-ভাগ আমি বেশি এঁকেছি।''[১৬]

সুবীর সরকার-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় অমিয়ভূষণ আরো বলেন ঃ

''দিনের পর দিন সাইকেলে চেপে আমি উত্তরবাংলার রাজবংশী আদিবাসীদের গ্রামগুলোতে ঘুরে বেরিয়েছি। ওদের জীবন, লোকসঙ্গীত সব কিছু লক্ষ্য করেছি। ভৌগোলিক এই অঞ্চলের জীবন কথা আমার বহু উপন্যাসের উপজীব্য। যেমন মহিষকুড়ার উপকথা - এটায় রাজবংশী জনগোষ্ঠীর জীবন কথা, যাপনচিত্র এসেছে। অথচ এর মূল চরিত্র চাউটিয়া বর্মণের রূপকে আমি কিন্তু আবহমান, প্রবহমান জীবনের কথা, জীবনের ছবিই বলেছি ও এঁকেছি। কাজেই আমার কোনও লেখাই আঞ্চলিক উপন্যাস নয়, যারা তেমন বলেন, তাঁরা বোকা, মূর্খ।''[১৭]

অর্জুন চন্দ্র দেবনাথ তাঁর গবেষণাপত্রে বলেছেন ঃ

''পূর্ব বাংলা আর কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে বাদ দিলে যে বিরাট ভুবন অমিয়ভূষণের লেখায় এসেছে তা হল উত্তরবঙ্গ, এখানে তাঁর জন্ম, পড়াশুনা, কর্মজীবনের বেশিরভাগ অংশটাই এ অঞ্চলে কেটেছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রায় অধিকাংশ রচনাতেই তার প্রভাব এসে পড়েছে। উত্তরবঙ্গ এমনই এক জায়গা যা কিনা সভ্যতার রঙমাখা মুখোসটা থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে। দূরে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে শাল-শিরীষের বন, আলো আঁধারির মিলন মেলা, রাতের নীরবতা ভেঙে যায় উত্তরের হিমেল হাওয়ায়। এখানে যেমন আকাশ আছে তেমনি আছে ঘুমের মতো পাহাড়। উল্লেখ্য যে, উত্তরবঙ্গ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর অংশের পাঁচটি জেলার সমাহার, যার প্রশাসনিক নাম জলপাইগুড়ি ডিভিশন। যার উত্তরে সিকিম রাজ্য ও ভুটান দেশ, পশ্চিমে বিহার রাজ্য ও নেপাল দেশ, পূর্বে আসাম রাজ্য ও দক্ষিণে গঙ্গানদী ও বাংলাদেশ। এই ভূ-ভাগে যেমন আছে হিমালয় পাহাড়, জয়ন্তী পাহাড়, তরাই-এর গহিন অরণ্য, তেমনি রয়েছে মহানন্দা তিস্তা তোর্ষা জলঢাকা কালজানি রায়ডাক সংকোশ মানসাই নোনাই সুতঙ্গা প্রভৃতি অজস্র পাহাড়ি নদী। কিশোরী মেয়ের মতো তাদের দুরন্তপনা। উত্তরবঙ্গের এই যে ভৌগোলিক মানচিত্র তার মধ্যেই জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন অমিয়ভূষণ। গ্রামের শহরের অলিগলি তাঁর নখদর্পণে। ধনী-মধ্যবিত্ত-সাধারণ মানুষের সঙ্গে নিত্য ওঠাবসার ফলে তাদের জীবনের সুখদুঃখ হাসি-কান্না আশা-আকাঙ্খার বিস্তারিত ফর্দও ছিল অমিয়ভূষণের ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার

মধ্যে, ফলে লেখক-জীবনের প্রথম থেকেই এই অঞ্চলের মানুষ প্রকৃতি সমাজ সংস্কৃতি রাজনীতি তাঁর কলমের ডগায় ফুটে উঠেছে। কোন পক্ষপাত নয়, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে অমিয়ভূষণ এই অঞ্চলের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। ফলে আঞ্চলিকতার আবহে আবদ্ধ না থেকে সার্বিক আবেদনে রসমন্ডিত হয়ে উঠেছে অমিয়ভূষণের সাহিত্য।"[১৮]

উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক বিবরণ ও নদনদী সম্বন্ধে একটু ধারণা নিয়ে রাখলে লেখায় সেগুলো কিভাবে এসেছে তা বোঝা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হবে। উত্তরবঙ্গের সংজ্ঞা ও সীমানা সম্বন্ধে আলোচনা থেকে জানা যায়, ভারতের জাতীয় মানচিত্রে উত্তরবঙ্গ বলে কোনো ভূখন্ডের উল্লেখ নেই এবং ভারতের কোনো ভূখন্ডকে উত্তরবঙ্গ নামে চিহ্নিত করার ঐতিহ্যও দেশের প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। উত্তরবঙ্গ বললে সাধারণভাবে দেশের যে এলাকাকে আমরা বুঝি, সুদূর অতীতে তো বটেই, এমনকি অদূর অতীতেও সেই এলাকার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রাজশক্তির অধীনে ছিল। সম্ভবত উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন ভূখন্ডে ইংরেজের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গার উত্তরে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমের সমতল এলাকায় একটি অখন্ড রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রনাধীন ভৌগোলিক এলাকার সম্ভাবনা দানা বেঁধে উঠতে থাকে। শুধু সমতল এলাকাতেই নয়, ইংরেজের আত্মপ্রসারণীর উদ্যোগেই সিকিম ও ভুটানের মতো সংলগ্ন পার্বত্য এলাকারও কিছু কিছু অংশ ক্রমে এই নিরবচ্ছিন্ন ব্রিটিশ শাসন কর্তৃত্বের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে মূলতঃ ব্রিটিশ আমলেই সমতল ও পার্বত্য এলাকা সমন্বিত বর্তমান উত্তরবঙ্গের একটা ভৌগোলিক প্রাক্-রূপ প্রথম আভাসিত হয়ে ওঠে। পরে ইংরেজ তার প্রশাসনিক প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে এই ভৌগোলিক এলাকার ইতস্ততঃ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস করেছে, ফলে কোনো কোনো এলাকা পার্শ্ববর্তী বঙ্গেতর প্রদেশের (যথা পশ্চিমে বিহার ও পূর্বে আসাম) অন্তর্গত হয়ে সাধারণভাবে বঙ্গীয় এলাকার বহির্ভূত হয়ে পড়েছে। এছাড়া, যেসব এলাকা ব্রিটিশ আমলে কখনো বঙ্গসীমান্তের বাইরে যায়নি, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের জন্য সেইসব এলাকারও আভ্যন্তরীন পরিচয় মাঝে মাঝে অল্পবিস্তর পরিবর্তিত হয়েছে। এই এলাকা পুনর্গঠনের কাজ ১৯৪৭

সালের ভারত বিভাগের সময় থেকে শুরু হয়ে তারপরও চলে এসেছে। ১৯৪৭ সালে উত্তরবঙ্গের বেশ খানিকটা অংশ বিদেশি রাষ্ট্রে অধীনে চলে গেল, যার রাজনৈতিক ও ভাষা-সাংস্কৃতিক পরিণাম সুদূরপ্রসারী। অন্যদিকে ১৯৪৭ সালের পরও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে উত্তরবঙ্গের চেহারা কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে, ১৯৫০ সালে প্রাক্তন করদ মিত্র রাজ্য কোচবিহার ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উত্তরবঙ্গের অন্যতম জেলা হিসেবে গণ্য হয়েছে, অন্যদিকে ১৯৫৬ সালে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিছু অংশকে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, ভৌগোলিক দিক থেকে এই অংশ পশ্চিমবঙ্গের উত্তর এলাকার অন্তর্ভুক্ত, কাজেই তা উত্তরবঙ্গের অঙ্গীভূত। ... উত্তরবঙ্গ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর অংশের পাঁচটি জেলার সমাহার, যার প্রশাসনিক নাম জলপাইগুড়ি ডিভিশন এবং যার উত্তরে সিকিম রাজ্য ও ভুটান দেশ, পশ্চিমে বিহার রাজ্য ও নেপাল, পূর্বে আসাম রাজ্য ও দক্ষিণে গঙ্গা নদী ও দক্ষিণ-পূর্বে বাংলাদেশ। আয়তনের দিক থেকে উত্তরবঙ্গ গোটা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। উত্তরবঙ্গে একদিকে যেমন আছে হিমালয় পাহাড়, জয়ন্তী পাহাড়, তরাইয়ের গহীন অরণ্য, তেমনি রয়েছে মহানন্দা, তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, কালজানি, রায়ডাক, সংকোশ, মানসাই, আত্রেয়ী, নোনাই, সুতঙ্গা প্রভৃতি অজস্র পাহাড়ি নদী। কিশোরী মেয়ে মতো তাদের দুরন্তপনা। ১৮৩৯ সালে ড. বুকানন হ্যামিল্টন কামতাপুর রাজ্য পরিদর্শন করে যে বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে জানা যায় যে কামতেশ্বর বা কান্তেশ্বর রাজার রাজধানী কামতাপুরের উত্তর দক্ষিণ এবং পশ্চিম এই তিন দিকে ছিল বিশাল মাটির প্রাকার বা গড় আর পূর্বদিকে ছিল বিশাল ধরলা নদী। জলঢাকা নদী কোচবিহার জেলার মধ্যে প্রবাহিত হবার পর নাম পাল্টে মানসাই, সিঙ্গিমারি এবং ধরলা নামে পরিচিত হয়েছে। জড়দা নদী জল্টেশের পাশ দিয়ে বয়ে কোচবিহারের চ্যাংড়াবান্ধার কাছে ধরলা নামেই প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে আবার কোচবিহারে ঢুকে শিবপুরের কাছে মানসাই বা জলঢাকা নদীতে পড়েছে। মানসাই এর পর সিঙ্গিমারী নামে কিছু দূর প্রবাহিত হয়ে গীতালদহের কাছে ধরলা নামে বাংলাদেশে ঢুকেছে এবং বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ব্রহ্মপুত্রে পড়েছে। তবে উত্তরবঙ্গের এই নদীগুলো বারবারই গতিপথ পরিবর্তন করছে, তাই এর অবস্থান কখনো একই জায়গায়

দেখা যায় না।[১৯]

উত্তরবঙ্গের পটভূমিতে অমিয়ভূষণের লেখা কয়েকটি উপন্যাস নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করা হল ঃ

গড় শ্রীখন্ড ঃ 'গড় শ্রীখন্ড' (১৯৫৭) প্রত্যন্ত পশ্চিমবাংলার কোচবিহারে এককালীন ডাকবিভাগের চাকুরে অমিয়ভূষণ মজুমদারের উত্তরবাংলা ও পূর্ব বাংলার পটভূমিতে এক সাড়া-জাগানো আঞ্চলিক উপন্যাস। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, ভাষারীতি সবদিক দিয়েই এটি অভিনবত্বের দাবি রাখে। শ্রী প্রমথনাথ বিশী-র মতে ঃ

> ''উপন্যাসের এই অঞ্চল পূর্ববঙ্গও বটে, আবার উত্তরবঙ্গও নিশ্চয়।''[২০]

লেখক খুব কাছ থেকে অনুভব করেছেন উত্তরবঙ্গকে। নগর চতুরালির কেন্দ্রবিন্দু থেকে বহুদূরে অরণ্যঘেঁষা উত্তরবঙ্গে স্বেচ্ছানির্বাসনে তিনি সৃষ্টি করেছেন একের পর এক ধ্রুপদী কথামালা।

'গড় শ্রীখন্ড'তে অমিয়ভূষণের রচনাশৈলী, ঔপন্যাসিক প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় সর্বাঙ্গে জড়িত। এটি ১৩৬০ বঙ্গাব্দে সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'পুর্বাশা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তা গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৪২-১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের সময়সীমার মধ্যে বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগের এক অনবদ্য আলেখ্য এই উপন্যাস। পদ্মার তীরবর্তী পাবনা জেলার চিকান্দি, বুধেডাঙা, চরণকাশি, মানিক-দিয়ার ও দিঘাবন্দরকে পটভূমি করে এই উপন্যাসটি রচিত হয়েছে।[২১]

ইতিহাস বোধ বুঝিয়ে দেয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে দাঙ্গা, দেশবিভাগ আর উদ্বাস্তু সমস্যা আসন্ন। উপন্যাসের গোড়াতেই আছে ঃ

> ''বাঙাল নদী পদ্মা এখানে বন্ধনে পড়েছে, 'বিরিজ' বলে লোকভাষায়।''[২২]

তাঁর অনেক উপন্যাসেই নদী আছে, নিছক তা নদী নয়, বরং প্রতীক হয়ে ওঠে। লেখকের মতে -

> ''আমার উপন্যাসে পদ্মা ফার্টিলিটি বহনকারী এক প্রচন্ড রূপবতী শক্তি, যার স্বাদ মধুর প্রাণদায়ী।''[২৩]

'গড় শ্রীখন্ড উপন্যাসের ৫৪২ পাতার মধ্যে আছে এক পালাবদলের পর্ব।

উত্তরবাংলার একটি রেলজংশন, তার চারপাশের মানুষজন। আবার শুধু সান্যাল পরিবারের ইতিবৃত্ত নয়, এখানে আছে মাটির কাছাকাছি ব্রাত্যজনের ছবি। যুদ্ধ মানুষকে গ্রাম বিচ্ছিন্ন করে শহরমুখী করে। কাহিনী শেষ হয় দেশবিভাগ আর উদ্বাস্তু সমস্যার ইঙ্গিত দিয়ে। গড় চিকিন্দির জমিদার পঞ্চাশ পার হওয়া সান্যালমশাই অতীত আর বর্তমান মেলাতে চাইলেও তা সম্ভব হয় না। এই উপন্যাসে প্রাধান্য পায় সুরতুন্নেছা, রামচন্দ্র মন্ডল, ছিদাম, এরফান এবং আরো অনেকে। শেষ পর্বে পাই ঃ

> ''থেকে থেকে পাথার মুখকালো হয়ে উঠেছে তখনো ফুলে ফুলে উঠছে তার বুক। উপরে মেঘ ডাকছে।''[২৪]

এ কে ? নদী না নারী ? টমাস মানের 'বাডেন ব্রুকস'-এর মতো গড় শ্রীখন্ড ভাঙনের পাশাপাশি অন্য এক সৃষ্টির ছবি। টমাস মান অবশ্য বাডেন ব্রুকস-এর শেষ দিকে লেখেন সংলাপে ঃ Life crushes so much in us, it destroys so many of our believes ! ব্যবধান দুস্তর, দেশ-কাল এবং দৃষ্টিভঙ্গির। তবু নির্মাণের মিল, সৃষ্টির নয়।[২৫]

একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে অমিয়ভূষণকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল -

> ''আচ্ছা একজন লেখকের ভাষার ব্যবহার কি মাঝে মাঝে communica tion-এর বাধা হয়ে দাঁড়ায় না ? আমি আপনার গড় শ্রীখন্ড উপন্যাসের কথা মাথায় রেখেই এ প্রশ্ন করছি।''[২৬]

উত্তরে অমিয়ভূষণ জানিয়েছিলেন ঃ

> ''একটা প্রবণতা এসেছে তা হল dialogue-এর মধ্যে আমি শ্রমিক-কৃষকের মুখের ভাষা তুলে দেবো। উত্তরবঙ্গের যে লিখছে, সে উত্তরবঙ্গের কৃষকের মুখের ভাষা তুলে দেবে। যারা সাঁওতাল পরগনার কাছাকাছি বীরভূম বাঁকুড়ার কথা লিখছে, তারা সাঁওতালদের মুখের ভাষা তুলে দেবে - এবং যত দিতে পারবে তত ভালো।'' তবে এতে আর একটি প্রশ্ন আসে কমিউনিকেশনকে যদি আমার সহজ করতে হত, তাহলে একটা উপন্যাস বারো আনা dialogue বর্ণনা অত্যন্ত কম, কেননা কমিউনিকেশনকে বেশি করতে গেলে বর্ণনাকে অত্যন্ত filmy এবং superficial করতে হবে। একজন সাধারণ পাঠক তিনপাতা ধরে টমাস হার্ডির প্রাকৃতিক বর্ণনা পড়বে, এটা আশা করা যায় না। বর্ণনা তাই বাদ দিতে হবে। এটা বাদ দিয়ে কী থাকছে ? থাকছে

dialogue - এখন এই dialogue যদি সাঁওতালী হয়, তবে আজ যদি আমি কোচবিহার বা জলপাইগুড়ির ভাষায় লিখতে থাকি তবে সেটা বৃহত্তর বঙ্গের অন্য কোথাও কমিউনিকেটই করতে পারবে না। তাহলে এধরণের দিতে বলাটা contrary to that diction of communication , দ্বিতীয়ত, কোন সাহিত্য কি বাই লিঙ্গুয়াল হয় ? তাই ডায়ালগ নতুন করে তৈরি করতে হয়। আমি সেই ডায়ালগটাই দেব যাতে মনে হবে যেন একটা লোকাল কালার আছে, কিন্তু কোন লোকালিটির - সেটা সর্বজনবোধ্য হতে হবে। যেমন - হার্ডি যে ডায়ালগ ব্যবহার করেছেন এক নম্বর বলে কোন জায়গাই নেই, দু নম্বর সেটা কোন প্রদেশের ভাষাও নয়। সেটা এমন একটা ডায়ালেক্ট যেটা সবাই বুঝতে পারে। আমার গড় শ্রীখন্ড-তেও ডায়ালগ দেওয়া আছে, মনে হবে পাবনার ডায়ালেক্ট, কিন্তু এ্যাকচুয়ালি তা পাবনার নয়।"[২৭]

খেলায় কাউকে কাউকে যেমন সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে কাউকে বা লখিন্দরের মতো জীবন ফিরিয়ে দেয় উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি ও মানুষ এই দুটি পর্বের বিস্তার আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে উপন্যাসে এমন মিলিত সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে যে উপন্যাসটিকে মহাকাব্যের সাথে তুলনা করা হয়। কেউ কেউ উপন্যাসে পদ্মাকেই প্রধান অভিধা দিয়েছেন। পদ্মাই যেন ইতিহাস, পদ্মা ছাড়া একটা জাতির কোনো অস্তিত্ব নেই। রামচন্দ্র প্রধান চাষীর চরিত্র হয়ে উপন্যাসে যেন কর্ষণ কার্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।[২৮]

গড় শ্রীখন্ড উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক পরিবেশ ইতিহাসচেতনা জনজীবন ব্যবহৃত ভাষা রীতিনীতি বা প্রথা কিভাবে উঠে এসেছে তা আমরা দেখাবার চেষ্টা করবো।

'গড় শ্রীখন্ড' উপন্যাসে পদ্মা সন্নিহিত উত্তরবাংলা ও পূর্ব বাংলা অঞ্চলের দৃশ্যপট ধরা পড়েছে। গাছগাছালি জলজঙ্গল নিয়ে উত্তরবাংলা ও পূর্ব বাংলার অপরূপা পৃথিবী। জল-বিল-হাওয়া-র পাশাপাশি রয়েছে জঙ্গল আর উঁচু উঁচু পাহাড়। এসব ছবির প্রতিফলন এই উপন্যাসের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে ঃ

"বাইরের দিকে চাইতে গিয়ে বহুপরিচিত কাঁঠাল গাছটার প্রথম ডালটায় তার চোখে পড়ল। কিছুদিন সে লক্ষ্য করেনি। মনে হলো যেন ডালটা বেড়েছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায় পাতা কাঁপছে। সেখান থেকে সরতে সরতে তার দৃষ্টি পড়ল আরো দূরের দৃশ্যপটে। দিগরের আবর্জনা বয়ে পাকা নালাটি

কিছু দূরে গিয়ে খানিকটা নিচু জমি প্লাবিত করে একটা জলা সৃষ্টি করেছে। বর্ষায় জল বেড়ে ছোট একটা বিলের মতো দেখায়। প্রথম চাকরি পাবার পর একদিন সে ছিপ নিয়ে গিয়েছিল মাছ ধরতে, খুব পাকা একটা শোল পেয়েছিল। এখন জল অনেক কমে গিয়েছে। জলের ধারে ধারে বুনো ঘাসের সবুজ ঝোপগুলোও ঠাহর হচ্ছে চোখে।"[২৯]

"পদ্মার তীরে বাঁধ একটি নয়, তিনটি। প্রথমটি জল ঘেঁষে চাঁই চাঁই পাথর মোটা মোটা তারের জালে বাঁধা। তার পিছনে প্রায় চার-পাঁচ হাত উঁচু বাঁধ, তারও পিছনে তৃতীয়টি, প্রায় ছোটোখাটো একটা পাহাড়ের মতো। দ্বিতীয় বাঁধের মাথায় ও তৃতীয়টির পায়ের কাছে একটি অধিত্যকা। এই অধিত্যকাটুকু শুধু ঘাসে ঢাকা নয়, বাবলা, খেজুর, ঝাউ, মানে ভেসে আসা কলা গাছ কাশে মিলে ছোটোখাটো একটা জঙ্গল সৃষ্টি করেছে। সে জঙ্গলে খ্যাঁকশিয়াল থাকে, খরগোস বুনো কাছিম দু-এক জাতের বকের খোঁজও পাওয়া যায়। জঙ্গলের মধ্যে ছোটোখাটো খাদ চোখে পড়ে। বর্ষায় প্রথম বাঁধ ছাপিয়ে দ্বিতীয় বাঁধের মাথার উপর দিয়ে তৃতীয়টির গোড়ায় গিয়ে লাগে জল। বর্ষার পর পদ্মা অনেক দূরে সরে গেলে এই ঘাসগুলি জলাশয়ের মতো দেখতে হয়। শরতের কাছাকাছি এসে খাদগুলির বেশির ভাগ শুকিয়ে যায়। দু-একটার জল থাকে এবং ময়লা থিতিয়ে গিয়ে সে জল টলমল করে।"[৩০]

"গ্রামের যে অঞ্চলে বসতি ছিল সেখানে এখন অগম্য জঙ্গল। সেই জঙ্গলে কিছু কিছু আম কাঁঠালের গাছ কখনও দু-একটা নারকেল গাছ চোখে পড়ে। কেউ হয়তো কোনো কালে সখ করে লাগিয়েছিল এখন জঙ্গুলে হয়ে গেছে এখন কয়েক ঝাড় কলা গাছও দেখতে পাওয়া যায়। কলা গাছে মোচা হয়েছে। নারকেল গাছে ফল আছে। সেকালে এটা বোধহয় গ্রামের একটা সড়ক ছিল, এখন অনেকাংশই লতাগুল্মে আচ্ছন্ন। গ্রামের যে অংশে চাষের জমি ছিল সে দিকে ভাঁটের আর বিচুটির জঙ্গল। এখানে সেখানে ছড়ানো কয়েকটা বাবলা গাছ।"[৩১]

"অবারিত মাঠ, অধিকাংশ জমিতে ধানের চাষ। দূরে দূরে চার পাঁচটি করে

কুঁড়ের এক-একটি গুচ্ছ। এখানে মাটি ক্রমাগত নিচু হয়ে গেছে দিগন্তের দিকে। পদ্মার নীল রেখায় সীমাবদ্ধ সেই দিক - সীমান্ত আকাশে রং লাগছে। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় আকাশ গড়িয়ে রঙের কয়েকটি স্রোতধারা পদ্মার দিকে নেমে আসছে।"[৩২]

"রামচন্দ্র নদী পার হয়ে লোকটির বাড়িতে গিয়েছিল। যে জমি সে দেখালো তার অধিকাংশ ময়না কাঁটা পিটুলি প্রকৃতি অকেজো গাছের জঙ্গলে ঢাকা।"[৩৩]

"এই এক দেশ শাল মহুয়ার নয়, নিমের এবং পাটের। ফাল্গুনে এখানে উদাস করা লাল রং নেই, এখানে গৈরিক অবান্তর। নিতান্ত মাটির দেশ। গাছগাছড়ার সবুজ রঙেও মাটির গাঢ়তা। বর্ষায় গাছপালাগুলো বাঁচবো বাঁচবো বলে দেখ্ দেখ্ করে বেড়ে ওঠে। তারপর আসে বর্ষণহীন সকরুণ দিন। ধূ-ধূ নিষ্ফল মাঠের দিকে তাকিয়ে চোখে পড়ে ফাটল-ধরা কালচে মাটি, ইতস্তত দু-একটা বাবলা গাছ। গাছগুলোর পাতা নেই, আছে শুধু শুকনো কাঁটা। প্রাণ শুকানো রৌদ্রে দাঁড়িয়ে আরও দৃঢ় আরো কর্কশ হবার তপস্যা করছে কাঁটাগুলি। বাঁচবো বাঁচবো এই রুদ্ধশ্বাস আকুতি সেগুলির। উদাসীনতা নয়, অত্যন্ত গভীর মোহ।"[৩৪]

"হঠাৎ রামচন্দ্র থেমে দাঁড়ালো। দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য। ভরুই পাখি। ধানের সঙ্গে তাদের যাওয়া আসা ঝাঁক বেঁধে তারা আসে, ধোঁয়ার মতো ধানের শিষগুলির উপরে ভেসে বেড়ায়।"[৩৫]

"অমিয়ভূষণের গড় শ্রীখন্ড উপন্যাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর, ৪৬-এর দাঙ্গা ও দেশবিভাগের আঘাতের মধ্যে পদ্মানদীর ধারের পাবনা জেলার চিকান্দি চিকন্দি, বুধেডাঙা, চরণকাশি মানিকদিয়ার গ্রাম আর বাদর দিঘাকে কেন্দ্র করে নানা ধরণের মানবজীবনের অভিঘাত বর্ণনা করা হয়েছে। সময়ের সমগ্রতাকে স্পর্শ করে যে জীবন বয়ে চলে জয় পরাজয়ের রথচক্রের মধ্যে যার সর্বদা অবস্থিতি তাই হবে মহৎ সাহিত্যের উপজীব্য। এই উপন্যাসে তার নিদর্শন পাওয়া যায়। সময়ের ভাঙাগড়ার তীরে মানুষ সমষ্টিগতভাবে

যে বাঁচার চেষ্টা করে তারই শিল্পরূপ 'গড় শ্রীখন্ড'। সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বে যেমন সমগ্র জীবন এখানে পরিস্ফুট সে কালের আঘাতে সেই জীবন কেমন টুকরো টুকরো হয়ে গেল। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা আর দেশভাগ মানুষের নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রাকে কেমন করে ওলটপালট করে দিল, তবে ভূমি উৎখাতে মানুষ অনেক কিছু হারিয়েছিল যদিও এসব কিছুকে অস্বীকার করে নতুন চর জাগার মতন তাদের নব প্রত্যাশায় এগিয়ে চলার আশ্বাসও লেখক আমাদের শুনিয়েছেন।"[৩৬]

'গড় শ্রীখন্ড' উপন্যাসে অনেক চরিত্র। কিন্তু সমগ্র আখ্যানের কোন নায়ক নেই। অমিয়ভূষণ নিজেই বলেছেন, উপন্যাসের নায়ক গড় শ্রীখন্ড। নায়িকা পদ্মা। নায়িকা পদ্মার পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, (১) বাঙাল নদী পদ্মা এখানে বন্ধনে পড়েছে। (২) পদ্মার গতি পরিবর্তন মানেই জমি ভাঙা আর চর জেগে ওঠা। যার জমি ভাঙে সে নিজের কপাল চাপড়ে চাপড়ে ফাটায় আর যার ভাগ্য চর পড়ে তার কপাল আপনি ফাটে। (৩) পদ্মা তীরে অনেক ঘটনায় পদ্মা নিজে এসে নায়িকা হয়। কখনো বা তার কোনো কাজ থেকে সাধারণ মানুষের সোজা জীবনযাত্রা প্রভাবিত হয়। পদ্মার এই ভাঙাগড়ার খেলা, তীরবর্তী মানুষের জীবনের সাফল্য আর ব্যর্থতার টানা-পোড়েনে পদ্মা যেন যথার্থ নায়িকা হয়ে ওঠে।

এ যুগে মহাকাব্য লেখা হয় না। তার স্থান দখল করেছে উপন্যাস। বস্তুত অমিয়ভূষণের ভাষায়, উপন্যাস সেই মহাকাব্য যা গদ্যে লেখা হয়। প্রকৃতপক্ষে অমিয়ভূষণের 'গড় শ্রীখন্ড' মহাকাব্য। মহাকাব্যের ত্রিস্তর জগতের বিন্যাস না থাকলেও পদ্মার তীরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আর্থ-সামাজিক পরিচয় উপন্যাসটিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে চরিত্র হিসেবে এসেছে সামন্ত শ্রেণির শিক্ষিত ভদ্র রুচিবান মানুষ থেকে শুরু করে রেলকর্মচারী, পুলিশ, সম্ভ্রান্ত হিন্দু, মুসলমান কৃষক আর ভূমিহীন দরিদ্র নানা বৃত্তির মানুষ। 'গড় শ্রীখন্ড' উপন্যাসের চরিত্র চিত্রন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

"ইহার পাত্রপাত্রীগণ পরস্পরের সহিত শিথিল সংলগ্ন ও মোটের উপর আপন আপন জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ তিনটি স্তরে বিভক্ত।"[৩৭]

এই উপন্যাসে শিক্ষিত-অশিক্ষিত ও ধনী-দরিদ্র নানা শ্রেণির চরিত্র রয়েছে। কিন্তু অর্থ, সম্পদ, খ্যাতি, অখ্যাতি, শিক্ষা, অশিক্ষার অন্তরালে এই উপন্যাসের প্রায় সব চরিত্রেই প্রাণপিপাসার পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। 'গড় শ্রীখন্ড' উপন্যাসের আখ্যানবৃত্ত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সাহিত্য-সমালোচক ড. অশ্রুকুমার সিকদার জানিয়েছেন, উপন্যাসটি কোনো একটি মূল কাহিনীর একরৈখিক বর্ণনায়ন নয়। চারিটি কাহিনীরও উপন্যাস সম্প্রদায় একটি বড় বৃত্তের মধ্যে সম্পর্কান্বিত হয়েছে।' এই আখ্যানবৃত্তগুলি হল -

(১) মাধাই সুরতুন-ফতেমা-ইয়াজ-ইসমাইল-ফুলটুসি-টেপির মা-গোঁসাই-টেপি-গার্ড সাহেবের কাহিনী।

(২)সান্যালমশাই-অনুসূয়া-সুনীতি-নৃপনারায়ণ-রূপনারায়ণ-মনসা-সদানন্দ মাস্টারের কাহিনী।

(৩) রামচন্দ্র-কৃষ্ণদাস-ছিদাম-মুঙলা-পদ্ম-সনকা-ভানমতীর কাহিনী।

(৪) আলেফ-এরফান-হাজীসাহেব-আল মামুদের কাহিনী।

বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত কাহিনীগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে উপন্যাসে এক অখন্ড আখ্যানবৃত্ত রচনা করেছে। আর এই আখ্যানবৃত্তের হাত ধরে উঠে এসেছে পদ্মা-নিকট উত্তরবঙ্গের মানবজীবনের নানা চিত্রপট, অনুভূতি, আর্থ-সামাজিক চিত্র।

'গড় শ্রীখন্ড' উপন্যাসটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে এর ভেতরে তিন ধরণের মানুষের কথা পাওয়া যায়। এরা মূলত উত্তরবাংলা ও পূর্ববাংলার মানুষ। যেন অমিয়ভূষণ খুব কাছের থেকে এদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করেছেন।

সাহিত্য সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'গড় শ্রীখন্ড' উপন্যাস নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এই রকম অভিমত পোষণ করেন। সুরো, ফাতেমা, মান্দার, রজব আলী, জয়নাল, টেপি, টেপির মা, মাধাই এরা প্রথম শ্রেণির। যাযাবর মান্দার গোষ্ঠী। তবে দুর্ভিক্ষ এদের গায়ের মেদ কেড়ে নিয়েছে। সুরতুন-ফাতেমা ফুলটুসিরা ট্রেনে চাল চালানোর অবৈধ ব্যবসা করে, মাধাই বিষ দিয়ে গরু মেরে তার চামড়া বিক্রি করে, টেপি নিজেকে বিক্রি করে অতিরিক্ত সুখ কিনতে চায়, টেপির মা পেটের দায়ে এক বৃদ্ধ বৈরাগীর জীবনযাত্রার সঙ্গিনী

হয়ে পড়ে। যে হালদার পাড়ার ছয়ঘর মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে সেই পাড়ায় তাদের বাস, আর রামচন্দ্র, কৃষ্ণদাস, মুঙলা, ভানুমতী, ছিদাম পদ্ম, আলেফ, এরফান, এরা দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত পরিশ্রমী মানুষ। তারমধ্যে রামচন্দ্র এই মাটির বলবত্তম সন্তান, তাই চাষবাস রামচন্দ্রের শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের হেতু নয়, জীবনের উদ্দেশ্যও বটে। সে পারলে পৃথিবীকে চষে ফেলে, চাঁদের দিকে তাকিয়ে ভাবে, জমি অনেক দেখি চাষা দেখি না। খরা মন্বন্তর বন্যা ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ে অপরাজেয় চিরন্তন কৃষক এই রামচন্দ্র, একবার নয়, তিনবার সেই দুর্ভিক্ষ, তারপর দাঙ্গা তারপর এই দেশভাগ পরপর এই তিনটি আঘাতে চাষবাসের স্বচ্ছলতা এদের জীবন থেকে সরে গেল। অন্যদিকে সান্যালমশায়, অনুসূয়া, নৃপনারায়ণ, মনসা, সুমিত তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত, অভিজাত পরিবারের লোক। জমিদারি বৃত্তির অবক্ষয়ের শেষ বৃত্তে এদের অবস্থান। কালের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত সান্যাল মশায়কে তাই ভাবতে হয় এই গ্রামে তিনি অবাঞ্ছিত, এখনকার জীবনের সাথে তার যোগ নেই, কি হবে তার নতুন ঘর বাড়ি তৈরি করে -

> ''গণগামিনী পদ্মা তাদের প্রতি বিমুখ, কালের স্রোত এবং পদ্মা তাদেরকে পরিহার করেছে।''[৩৮]

তাই গ্রাম ছেড়ে এদেরকেও চলে যেতে হয় নতুন জীবনের সন্ধানে। সান্যাল মশাই চেয়েছিলেন যে হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি এই একই কালের চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন। কৃষকদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মিশ্রিত সম্ভ্রম নিয়ে প্রাচীন ভুঁইঞাদের মতো বীরত্বে শেষবারের মতো রুখে দাঁড়াবেন। কিন্তু সেটাও সম্ভব হল না। কেননা কালের আঘাতে সান্যাল মশাইকে ক্ষতবিক্ষত পরাজিত হয়ে যেতে হয় গ্রাম ছেড়ে নতুন জীবনের সন্ধানে। গড় শ্রীখন্ড ছেড়ে নতমস্তকে নতুন আশ্রয়ের দিকে যে সান্যালমশাই চলে যান তিনি তখন জীবনের মূল স্রোত বিযুক্ত নিঃসঙ্গ পরাজিত এক মানুষ। দেশভাগ দুর্ভিক্ষ মানুষের মূল্যবোধকে ভেঙে দিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন একাকী করে দিয়েছিল। জমিদার সান্যাল মশাইয়ের গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার বর্ণনায় লেখক জানিয়েছেন -

> ''রামচন্দ্র কাছারিতে প্রবেশ করলো দুঃসময়ে, কাছারির অর্ধেক দরজা বন্ধ। সান্যাল মশাইয়ের খাস কামরার দরজায় মস্ত বড় একটা তালা ঝুলছে।

কাছারিতে দাঁড়িয়ে অন্দরমহলের দোতলার যে জানালাগুলি চোখে পড়ে সেগুলিও বন্ধ। দুপুরের মতো তাজা রোদে এটা ঘুমের দৃশ্য হতে পারে না। এতক্ষণে অন্তত একজন বরকন্দাজেরও দেখা পাওয়া উচিত ছিল। বরকন্দাজ এলো না, আমলারা কোথায় ? প্রজারা সব সুনসান দিগরের গোরস্থান। নায়েব নিজেই বেরিয়ে এলো কাছারির একটা ঘর থেকে, নায়েবের হাতে হুঁকো, সে যেন বার্ধক্যে নুয়ে পড়েছে, রামচন্দ্রের মনে হল মুঙলা নায়েবের সঙ্গে যে কলহ করেছে সেটা মিটিয়ে ফেলা উচিত, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সেটাকে মূল্যহীন বোধ হল।

''নায়েব বললো, তুমি বুঝি সেই খবরটাই চাও ? অনেকেই জিজ্ঞাসা করেছে।

কী খবর ?

খবরটা সত্যি। কর্তা আর গিন্নি চলে গেছেন দেশ ভ্রমণে।

রামচন্দ্র এত বড় নির্দয় সংবাদ আশা করেনি। অভিভূতের মতো সে বললো, ছাওয়ালরা ?

তার আগেই গেছে। দেশভাগের কথা শুনলে রামচন্দ্র ? রামচন্দ্রের মনে হলো দুঃস্বপ্নের মধ্যে কেউ তার বুকে চেপে বসেছে।''[৩৯]

এই দেশভাগের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ অনেকখানি। নিজের ভিটেমাটি ছেলে অসংখ্য মানুষ এই জনপদেই নতুন করে বসতি গড়েছেন। তাদের স্বপ্নভঙ্গ-যন্ত্রণা-বিষাদ-ক্ষোভ-বেদনা আর বেঁচে থাকার লড়াইয়ের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ গভীরভাবে পরিচিত।

আবার 'গড় শ্রীখন্ড' উপন্যাসের চরিত্রগুলোর দিকে যদি তাকাই তাহলে চোখে পড়বে প্রতিটি চরিত্র কোনো না কোনো উদ্বাস্তু-জীবনযন্ত্রণা কিংবা হতাশা ও গ্লানির মধ্য দিয়েই জীবন অতিবাহিত করছে, যে সুমিতি সান্যাল বাড়িতে প্রচলিত সমস্ত নিয়ম ভেঙে গর্ভবতী অবস্থায় প্রথম নববধূ হিসেবে প্রবেশ করেছিল, চেয়েছিল এতদিনের বদ্ধ খাঁচায় একটু নতুন আলো প্রবেশ করুক, তাকেও সন্তান সাথে করে চলে যেতে হলো। হয়তো বা সেখানে নতুন কোনো আরম্ভের সম্ভাবনা। আর রামচন্দ্র খরা মন্বন্তর বন্যার মাঝখানে চাঁদ সদাগরের মতো দৃপ্ত পৌরুষে ভাস্বর। তাকেও দেখি কালের অভিঘাতে নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনায় মথিত হতে, তাই বোধহয় রামচন্দ্র পদ্মকে ছিদামের কাছ থেকে নিজের জীবনে টেনে নিয়ে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। আর

ছিদাম যে কিনা পদ্মকে নিয়ে ঘর সংসার করার স্বপ্ন দেখে দিবারাত্রি কাজে মনোযোগ দেয়। কিন্তু যখন দেখলো তার জীবনে পদ্মকে স্থান দেওয়া সম্ভব নয়, তখনই নিঃসঙ্গতা তাকে গ্রাস করে। যার পরিণতিতে মৃত্যু ঘটে শ্রীদামেরও। কেষ্টদাস যে সংসার জীবনে সুখী হয়েও শেষ জীবনে পদ্ম বৈষ্ণবীকে নিয়ে জীবন কাটাতে চায়। কিন্তু বার্ধক্য তাকে ঘিরে ধরেছে। ফলে যৌবনে টুলটুল পদ্ম ছিদামকে সঙ্গ দিয়ে কিংবা সঙ্গ নিয়ে জীবনের নতুন স্বপ্ন দেখে, কেষ্ট তা বুঝতে পারে। কেননা পদ্মকে দিয়ে তার নিঃসঙ্গতা ঘুচবে না। তাই কেষ্ট দাস একদিন সমস্ত কিছু ছেড়ে নবদ্বীপে তীর্থ করতে বেরিয়ে পড়ে, আর মুঙলা ও ভানুমতীকে নিয়ে বর্ধমানে চলে যেতে চায়। কেননা, দেশভাগ, দাঙ্গা আর নিঃসঙ্গ জীবন এইসব চরিত্রগুলিকে কুরে কুরে খেয়েছে। যে দেশভাগ ও দাঙ্গার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ বিশেষভাবে পরিচিত। বহু উদ্বাস্তু মানুষজনের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে উত্তরবঙ্গ।

মহিষকুড়ার উপকথা ঃ অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'মহিষকুড়ার উপকথা' ১৩৮৩-তে 'শারদীয় ঘরোয়া' পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছিল, প্রথম গ্রন্থাকারে বের হয় জুলাই ১৯৮১-তে। এই উপন্যাস যেন উত্তরবঙ্গের অরণ্যকেন্দ্রিক গ্রাম ও মানুষের জীবন্ত দলিল। এখানে উত্তরবঙ্গের অরণ্য তার সমস্ত বৈভব আর রহস্য নিয়ে, মায়া নিয়ে, সৌন্দর্য নিয়ে উপস্থিত। কোচবিহার শহরের মাইল দুয়েক দূরে মহিষবাথান নামে একটি ছোট্ট জনপদ রয়েছে। সবুজে ঘেরা একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ যেন। কুড়া শব্দটির অর্থ জলাশয়। উত্তরবঙ্গের অনেক গ্রামের নামই এমন জলাশয়ের অনুষঙ্গে রচিত হয়েছে। মহিষকুড়া আদতে একটি নদীর নাম, পরে তা হয়ে যায় গ্রামের নাম। অমিয়ভূষণ তাঁর এই উপন্যাসে বলেনঃ

> ''অন্যদিকে দ্যাখো এই মহিষকুড়া, কিংবা ভোটমারি অথবা তরুকাটা গ্রামগুলোকে। তারা যেন বনের কোলে ঘুমায়, বনের বুকে খেলা করে, দুঃখে বনের বুকে মুখ রেখে কাঁদে। এসব দেখে আমার একবার মনে হয়েছিল অরণ্যের দুই রূপ আছে, একরূপে সে আশ্রয় দেয়, অন্যটিতে সে প্রতিহত করে।''[৪০]

মহিষকুড়ার নাম ভূগোল বইয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অমিয়ভূষণ নিজে বলে না দিলেও অবশ্য মহিষকুড়ার অবস্থান বর্ণনা থেকে বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না। কোচবিহার-আলিপুরদুয়ার অঞ্চলে পাহাড়-অরণ্য-নদী আর নদীর খাত-ঘেরা কোনো এক ছোট নগণ্য গ্রাম। আকাশ থেকে দেখলে মনে হয় সবুজ সাগরে যেন এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। যেখানে পৌঁছতে হলে জীপ গাড়ির বহর সাজিয়ে 'অভিযান' করতে হয়। এখনও যেখানে বনের হিংস্র জন্তুর দেখা মেলে, আর যেখানে বাস করে 'বনে পথ হারিয়ে যাওয়া এক মানবগোষ্ঠীর বংশধর, যারা এই বিচ্ছিন্নতাকে চোখের মণির মতো রক্ষা করে।' অরণ্যের শাল-সারির ভিতর দিয়ে সরু সরু পায়ে চলা পথ আছে, আর আছে গরুর গাড়ি এমনকি জীপ চলতে পারে এমন মেটে-পথ, যে পথ শেষ হয়েছে বনের বুক চিরে এগিয়ে যাওয়া কালো কোনো পিচের পথে। এই অরণ্যের মধ্যে তুরুককাটা, ভোটমারি, ছোট শালবাড়ির মতো ছড়িয়ে আছে অনেক গ্রাম। বন থেকে এই গ্রামকে আলাদা করা যায় না। মহিষকুড়া এই রকম একটি গ্রাম যাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ইতিহাস-উপকথা-রূপকথা।

কোচবিহার শহরের মাইল দুয়েক দূরে মহিষ বাথান বলে একটা ছোট্ট জায়গা আছে, যা এখন অনেক বদলে গেছে। তবে তারাশঙ্করের রাঢ় অঞ্চলের মতো অমিয়ভূষণ মহিষকুড়াকে ভৌগোলিক বা অন্য দিক দিয়ে চিহ্নিত করেননি। মহিষকুড়া আদতে নদীর ছিল নাম। পরে হল গ্রামের নাম। যেখানে বুনো মোষ, আর মোষ ধরবার বেদিয়ারা ছিল। যারা তিন-চার মাস থাকত মোষ ধরা, পোষমানানো এবং বিক্রি করার কাজে। কিন্তু একদিন সেই মোষগুলি কিংবা সেই মানুষগুলি কোথায় গেল কেউ জানে না।

অমিয়ভূষণ এখানে তাঁর উপন্যাসের স্থান বিন্যাস করছেন। যে গ্রামকে তিনি গল্পের পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন তার নাম থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় সেটা বাস্তবের কোনো গ্রামের নাম না হলেও উত্তরবঙ্গেরই কোনো অঞ্চল। গল্প উপন্যাসে এই অঞ্চল বিন্যাসের বিশিষ্টতা আছে। প্রত্যেকটি গল্পের বা উপন্যাসের ক্ষেত্রভূমি তার কাহিনী ও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। পথের পাঁচালীর গল্প নিশ্চিন্দিপুর নামক গ্রামকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। তা অন্য কোনো নামের গ্রাম হতে পারত, কিন্তু কোনো শহরকেন্দ্রিক পটভূমিতে ঘটে উঠতে

পারত না। তাহলে গল্পের প্রাণই থাকত না। পথের পাঁচালীর গল্পটার জন্য ঐ রকম একটি গ্রামীণ পটভূমি গ্রামের পথ পুকুর বাগানঘেরা ক্ষেত্রভূমি দরকার ছিল। এই দিকটি দেখলে বুঝতে পারা যায় গল্পে স্থান বিন্যাসের গুরুত্বের কারণ কী। প্রত্যেক লেখককে গল্পের এই স্থান নির্বাচন করবার সময় কাহিনী ও পাত্রপাত্রীর ক্ষেত্রে তার প্রভাবের কথা মনে রেখে তা নির্বাচন করতে হয়। স্থান বা পটভূমি যেন গল্পের ঘটনা বিন্যাসের পক্ষে উপযোগী হয়ে ওঠে। স্থান এমন হবে যা গল্পের ঘটনা ঘটিয়ে তোলার সহায়ক। স্থান যেন একটা সজীব সবল সত্তা যা গল্পের কাহিনী ও চরিত্রের নির্মাণে অত্যন্ত দরকারী। মনে করা যাক পদ্মানদীর মাঝি গল্পের কথা। যে পটভূমিতে কাহিনী উপস্থাপন করা হয়েছে তা পদ্মানদীর তীরবর্ত্তী স্থান। কিন্তু পদ্মা নদী এ গল্পে একটি সজীব সত্তা। তার সেই সবল উপস্থিতি যেন তীরবর্ত্তী মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে - তারই খেয়ালের খেলায় পদ্মাতীরবর্ত্তী মানুষগুলির জীবন মেতে উঠেছে। তাতে জীবনমৃত্যু ঢেউ লেগেছে কিন্তু সেই ঢেউ পদ্মার ঢেউয়ের মতোই মাঝিরা তাতে জীবন ভাসিয়ে ভেসে চলেছে।

আমাদের আলোচ্য উপন্যাস 'মহিষকুড়ার উপকথা'। মহিষকুড়া এখানে উত্তরবঙ্গেরই একটি গ্রাম। অমিয়ভূষণ তাকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দিয়েছেন ঃ

১. আকাশ থেকে দেখলে মনে হয় বিস্তীর্ণ সবুজ সাগরে একটা বিচ্ছিন্ন ছোট্ট দ্বীপ। উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের মধ্যে একটি দ্বীপের মতো ছোট গ্রাম মহিষকুড়া।

২. এরই মতো অন্যান্য গ্রামগুলির নাম তুরুককাটা কিংবা ভোটমারি কিংবা নিছক ছোট শালবাড়ি। তুরুককাটা বা শালবাড়ি অন্য কোনো জায়গার গ্রাম হলেও হতে পারে, কিন্তু 'ভোটমারি' বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গে ছাড়া অন্য কোথাও হওয়া প্রায় অসম্ভব।

৩. অমিয়ভূষণ গ্রামের নাম দিয়েছেন মহিষকুড়া। 'কুড়া' কথাটি এই উত্তরবঙ্গের জলা অংশ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

> ''কুড়া ডোবা, দোলা জমি ক্রমশ দহ হতে পারে, নদীখাতের গভীরতর অংশ।'' [৪১]

এখন নদীটা মহিষকুড়া গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে সরে গেছে। কিন্তু আগে 'মহিষকুড়া ছিল নদীর নাম।'

৪. এরকম নাম হবার কারণও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন -

''নদী যখন বহতা ছিল খিন এই নদীতে বারবার বুনো মোষের আড্ডা জমত।'' [৪২]

এজন্য এর নাম মহিষকুড়া।

লেখক মহিষকুড়ার উপকথা লিখেছেন। প্রথমে তিনি সাধারণভাবে এবং পরে বিশেষভাবে 'মহিষকুড়া'র কথা বলেছেন। উত্তরবঙ্গের নদী অরণ্য ঘেরা এক নগণ্য গ্রাম মহিষকুড়া। স্থানের নিশ্চয়তা স্থির করে দেবার জন্য তিনি যেমন 'কুড়া'অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন তেমনি বুনো মোষের বাসস্থান হিসেবে জায়গাটির নামের পূর্বপদ 'মহিষ' ব্যবহার মরেছেন। আর এই বুনো মোষের দলবদ্ধ বাসস্থানকেই বলেছেন মহিষকুড়া। তিনি আরও বলেছেন -

''জলের ধারে আধডোবা চর বা ঘাসবনে এই বুনো মোষদের আড্ডা।''[৪৩]

কাজেই মহিষকুড়ার স্থান সংস্থান পর্যাপ্তভাবেই করা হল। আর এর সঙ্গেই এল মোষ দরা বেদিয়াদের কথা - তাদের সাহসকৌশল এবং জীবন-মরণ তুচ্ছ করে জীবিকার জন্য মোষ ধরার বর্ণনা। মহিষকুড়া এবং মোষ ধরার বেদিয়াদের কথা রইল প্রেক্ষাপট হিসেবে। এই পটভূমিতেই এবার আসবে 'উপকথা'। লেখক প্রথমে অঞ্চলের পরিচয় দিলেন তারপর এলেন মানুষের কথায় - বেদিয়াদের কথার সূত্রে গল্পে মানুষের কথা এল। কারণ এই গল্পে সেই বেদিয়াদের কথাই উঠবে - কিন্তু ভিন্ন ভাবে ভিন্ন কথা সূত্রে।

গল্পের শুরুতে সর্বজ্ঞ লেখকের কথনবিন্যাস। এখানে যে বর্ণনা আছে তাতে প্রেক্ষাপটের বিবরণ। তারপর মহিষকুড়ার জাফরুল্লা ব্যাপারীর কথা তুলে তিনি বিশেষ করে তার বাথানের মোষের কথায় চলে গেছেন। আর বাথানের সেই মোষের কথা বলতে গিয়ে গল্প উঠে এসেছে চাউটিয়ার (২য় বক্তা) মুখে। চাউটিয়া বর্মণ জাফরুল্লার বাথানে কাজ করে। সেই বলে জাফরুল্লার বাপ ফয়েদুল্লার এক বুনো মোষের গল্প। ফয়েদুল্লা একসময় ছিল ভৈষ-বাউদিয়ার দলপতি চাউটিয়ার বাপ ফান্দির কাজ করত। সেই দশ বছর আগেকার বুনো মোষ (নাকি বাইসন) আসার গল্প বলে। আর তারপর এই গল্প উঠে আসে আসফাকের চিন্তা সূত্রে। কাজেই গল্প বলার একটা মুন্সীয়ানা

এ উপন্যাসে আছে। এবং প্রথম দিকে গল্পের মূল বিষয়টাই অনুপস্থিত থেকে কেবল গল্পের পরিপার্শ্বপরিক্রমা চলে। আসফাকের মুখ দিয়ে একসময় লেখক 'পাওয়ার' কথাটার ব্যক্তিগত উচ্চারণ শোনান - পায়োর। কথাটা আসফাক কিছুদিন আগে শিখেছে। এই পাওয়ার কীভাবে আসফাক ও কমরুনের জীবনের ছবিটাকে ওটলপালট করে দিল সেটাই গল্পের মূল কথা। গল্পের ভিতরে ঢোকবার আগেই লেখক আসফাককে আমাদের সামনে এনেছেন তখন সে নিজের মনের কাছে দোষী - আত্মদ্বন্দ্বে বিচলিত। লেখক দেখাচ্ছেন কীভাবে জাফরুল্লার পাওয়ার শোষণের মূল কথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে - কীভাবে জাফরুল্লা পাওয়ার থেকে আরও পাওয়ার পাচ্ছে। জোতদার থেকে পঞ্চায়েতের প্রধান হচ্ছে আর আসফাকের মতো মানুষেরা নিজের স্ত্রী-পুত্রকেও তার হাতে তুলে দিয়ে দূরে গভীর জঙ্গলে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

গল্পটার ভিতরে আছে আসফাকের হাকিমের কাছে জাফরুল্লার সম্বন্ধে নালিশ। সে হাকিমের সামনে জাফরুল্লার সম্বন্ধে নালিশ করেছিল - মাইনে পায় না। জাফরুল্লা তাকে জমি দিয়েও ফিরিয়ে নিয়েছিল। লেখক বলেছেন তার ''নালিশ হল অব্যক্ত মনের কথা, অনেক কথা''[৪৪] হাকিমের কাছে এসব কথা বলে আসফাক নিজেকে ''ভারমুক্ত''[৪৫] মনে কলছিল। তারপরই মুন্নাফ এসে তাকে আব্বাজানের জন্য ওষুধ আনতে বলে। আর এই ওষুধ আনতে যাবার পথে নিজের কথা বলার সূত্রে নিজের মনের দ্বন্দ্বে অস্বস্তিতে পড়ে আসফাক। সেই ''অস্বস্তিটাই যেন উষ্ণ হয়ে''[৪৬] তার গতিকে শ্লথ করে দেয়। আসফাক এই শহরে পথে বেরিয়ে নিজের এই চিন্তাসূত্রে তার আগেকার জীবনের কথায় চলে আসে। গল্প বলার এই স্টাইলটা মহিষকুড়ার উপকথার একটি বিশিষ্ট দিক। তার জীবনকথার সূত্রে উঠে আসে কমরুনের কথা - তাদের জীবনের কথা। কীভাবে বাড়ি ছেড়ে শূন্য হাতে চলে আসা আসফাক কমরুনের দেখা পেয়েছিল - কমরুনের জীবনের সেসব দিনগুলো কীরকম অসহায়তায় কেটেছিল যাযাবর গোষ্ঠীর লোকেরা বসন্তরোগে মৃত কমরুনের স্বামীর সঙ্গে কমরুনকে একা ফেলে চলে গিয়েছিল সেসব কথা বর্ণনার কৌশলে অপরূপ হয়ে উঠে আসে। উপন্যাসকার প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে আসফাকের প্রতি মুহূর্তে বঞ্চিত অসহায় জীবনের রূপ উন্মোচন করতে করতে এগিয়ে যান। গল্পের সেই বঞ্চণা শোষণের উত্তাপহীন অথচ একটা প্রতিবাদী ভঙ্গী

সবসময় বজায় থাকে। এতে প্রতিটি কাহিনী বর্ণনার সূত্রে মিশে থাকে উত্তরবঙ্গের জীবনকথার পর্যালোচনা।

আসফাক কোথা থেকে চলে এসেছিল তার উল্লেখ নেই কিন্তু যে আরণ্যে সে আশ্রয় পেয়েছিল সেই অরণ্যেই সে দেখা পেয়েছিল কমরুনের। কমরুন আর তার সঙ্গীরা মোষ নিয়ে সেই বনে তাঁবু ফেলেছিল। সেই জায়গার বর্ণনা দিয়ে লেখক লিখেছেন ঃ

> ''যেখানে উত্তর আকাশের গায়ে নীল মেঘের মতো পাহাড় সব সময় চোখে পড়ে। শালের জঙ্গল তারপর কৃষকদের ঘরবাড়ি জোতজমা। হলুন ফসল। তারপর আবার সবুজ বন।''[৪৭]

এই অরণ্যে নীল মেঘের মতো পাহাড় যে হিমালয় সেকথা আগেই বলা হয়েছে। আর এ অরণ্যে উত্তরবঙ্গের রূপ। কমরুন আর তার সঙ্গীরা 'বাউদিয়া', তারা মোষ ধরে মোষ চরায়। এই বাউদিয়াদের কথা দিয়েই গল্প শুরু হয়েছে। এক সময় যে বাউদিয়ারা মহিষকুড়ায় মোষ ধরতে আসত তার কথা বলেই গল্পের শুরু। শুধু তাই নয় জাফরুল্লার ঠাকুর্দা ফয়জুল্লার বাবা এক সময়ে ছিল এই বাউদিয়াদের দলপতি। কিন্তু এখন ফয়জুল্লা সে কাজ করে না, এখন তার অনেক জমিজিরেত। এই মোষের বাসস্থান মোষ ধরার বাদিয়া সম্প্রদায়, তাদের বৃত্তি ছেড়ে ক্রমশ জমিজিরেত নিয়ে সম্পন্ন ভূস্বামী হয়ে ওঠা এবং ক্রমশ আরো বেশি সম্পদ ও ক্ষমতা আহরণ করার গল্প এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়। আসফাক কমরুনের সম্পর্ক দুই নিঃস্ব মানুষের গড়ে ওঠা সম্পর্ক। কমরুনকে জাফরুল্লার ''চার নম্বর বিবি''[৪৮] করে নেবার মধ্যে আছে জাফরুল্লার দম্ভ। কমরুন আর আসফাক যে বনের মধ্যে ঘুরেছে সেই বনটা আসাম দেশের উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে বছর খানেক হাঁটবার পর পাওয়া একটা জায়গা।[৪৯] জাফরুল্লার বাড়ির কাজে লেগে পড়বার আগে তাদের শেষ সম্বল একটিমাত্র বুড়ি মোষ মরেছে। তারা নিঃসম্বল হয়েই মহিষকুড়ার পথে রওনা হয়েছে। এদিকে গ্রামগুলো যেমন বনের মধ্যে হঠাৎ জেগে ওঠা এও তেমনি একটি গ্রাম। আর এই বনের জমি দখল করেই ফয়জুল্লা অনেক জমিজিরেতের মালিক হয়ে উঠেছিল। ফয়জুল্লার বাথানে যে মোষগুলোর কথা দিয়ে গল্প শুরু হয়েছে সেই গল্পে আছে এক বন্য মহিষ বা বাইসনের কথা।

এই উপন্যাসের পাতার পর পাতা জুড়ে উত্তরবঙ্গের প্রকৃতির উপস্থিতি। কিছু দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে ঃ

''আর সে পথ শেষ হয়েছে বনের বুক চিরে এগিয়ে যাওয়া কালো কোন পীচের পথে কিংবা সে পথ কিছুদূর পর্যন্ত মিশে থেকে আবার তা থেকে পৃথক হয়ে আর একটি নগণ্য গ্রামের দিকে চলে গিয়েছে, সে গ্রামের নাম হয়তো তুরুককাটা, কিংবা ভোটমারি, কিংবা নিছক ছোট শাল বাড়ি। - সেসব গ্রামও জঙ্গলে ঘেরা।''[৫০]

''বর্ষার জলে ভরে ওঠে সেগুলি, অন্য সময়ে দু-একটি ছাড়া অন্যগুলি শুকিয়ে যায়। খুব ভারি বর্ষায় যখন কুড়াগুলোর মধ্যেকার সংযোগ বেয়েও জল চলে, আবার নদীর মতো দেখায়। নদী যখন বহতা ছিল তখন এই নদীতে বারবার বুনো মোষের আড্ডা জমত। কিছু দূরে দূরে যেন নিজ-নিজ চারণভূমির সীমার মধ্যে পঁচিশ-ত্রিশটি করে মোষের এক-একটি দল।''[৫১]

''দুটো আসশেওড়া আর একটা বুনো কুলের ঝোপ। ছোট ঝোপ, এপারে দাঁড়ালে ওপার দেখা যায়। মাঝে মাঝে ঘাস আছে, এক দেড় হাত উঁচু, কিন্তু বেশির ভাগ জমি দূর্বা ঢাকা।''[৫২]

''তার সামনে একটা ঘাসবন। বনটা নতুন হয়েছে। কুশের জাত। এক কোমর উঁচু হবে। সেই ঘাসের গোড়ায় একরকমের লতা। তাতে নাকছাবির মতো ছোট ছোট নীল ফুল।''[৫৩]

''ঘরগুলোর পিছন দিকে বাঁ-পাশে একটা ছোট বনের আভাস ঘিরে কতগুলো গাছের মাথা। সবুজ ক্ষেতের মতো স্তরে স্তরে বিন্যস্ত। মেঘ নয় তা বোঝা যায় এজন্য যে গাছগুলোর মাথার উপর দিয়ে নীল মেঘের ঢেউ। ওটাও অবশ্য মেঘ নয়। পাহাড়।''[৫৪]

''অবশেষে এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছিল সে যেখানে উত্তর আকাশের গায়ে নীল মেঘের মতো পাহাড় সব সময়েই চোখে পড়ে। শালের জঙ্গল।

তারপর কৃষকদের ঘরবাড়ি, জোতজমা। হলুদ ফসল। তারপর আবার সবুজ বন। এমন করে বন আর কৃষকদের জমি পর পর।"[৫৫]

"সেই বনের মধ্যে এখনও নদী আছে, তীব্র স্রোতের ঝর্ণা আছে, তড়াগ-পল্বল সরোবর আছে, একপ্রান্তে তো নীল পাহাড় আবেগের ঢেউ বুকে হিমালয়ের দিকে এগিয়েছে।"[৫৬]

"বর্ষার জলে ভরে ওঠে সেগুলি, অন্য সময়ে দু-একটি ছাড়া অন্যগুলি শুকিয়ে যায়। খুব ভারি বর্ষায় যখন কুড়াগুলোর মধ্যেকার সংযোগ বেয়েও জল চলে, আবার নদীর মতো দেখায় ।নদী যখন বহতা ছিল, তখন এই নদীতে বারবার বুনো মোষের আড্ডা জমত। কিছু দূরে দূরে যেন নিজ-নিজ চারণভূমির সীমার মধ্যে পঁচিশ-ত্রিশটি করে মোষের এক-একটি দল।" [৫৭]

"আর এ ঘাসও খুব মিষ্টি। লটা বলে। গোড়ার কাছে এক রকমের মিষ্টি রস থাকে।"[৫৮]

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার কামাক্ষ্যাগুড়ির প্রান্ত পেরিয়েই আসাম। এখানকার প্রকৃতি খাবারদাবার পাখপাখালির পরিচয়ের মধ্যেও উত্তরবঙ্গের গন্ধ ঃ

"মোষের পিঠে তাঁবু চড়িয়ে কামরুন একদিন হাঁটতে শুরু করেছিল। পিছন পিছন আসফাক। দু-তিন দিনে দলটা খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। কামরুন জানত, সাধারণভাবে উত্তর-পশ্চিম দিকে যাবে দলটা। দলকে পাওয়া সহজ নয়। সেই গহন বনের মধ্যে তারা কোথায় গিয়েছে মোষগুলো তাড়াতে তাড়াতে কে বলে দিতে পারে ? বিশেষ করে যে দলের কোনো গন্তব্যস্থল নেই, জন্ম থেকে মৃত্যু যারা কেবলই ছুটে বেড়ায়। আসাম বলে নাকি এক দেশ আছে। ... পাহাড় আর তার কোল ঘেঁষা বনের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে হয়তো চেনা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এরা চলে যাবে। বন থাকলেই হল ! সন্ধ্যায় সেখানে মানুষের চোখে পড়ে না, এমন জায়গায় তাঁবু ফেলে সারাদিনের সংগ্রহ আগুনে ঝলসে খেয়ে রাত কাটতো আসফাক আর কমরুনের। সকালে তাঁবু গুঁটিয়ে মোষের পিঠে তুলে দিয়ে হাঁটা, আর হাঁটতে হাঁটতে চারিদিকে চোখ রাখা, বনমোরগ তিতির ডাহুক বক মেটে আলু চৈ

চ্যাং শাটি কুবলা গজার সংগ্রহ করার দিকে। মেটে আলুর লতা দেখে আসফাক একবার প্রায় দশসের আলু সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু ঝালের জন্য চৈ খুঁজে বার করতে কমরুনই পেরেছিল। কমরুন শুধু বয়সে বড় নয়, (কমরুন তখন এক কুড়ি পাঁচ ছয়, আর আসফাকের এক কুড়ি হয়নি) অনেক বিষয়েই আসফাকের তুলনায় অভিজ্ঞ। পাখি শিকার, সেই মাংসকে খাদ্যে পরিণত করা, এমনকি লোহা আর পাথর ঠুকে আগুন জ্বালানো, মাছ মাংস না পুড়িয়ে তাকে সুস্বাদু করা সেই আগুনে, কলাগাছের ভোতা পুড়িয়ে ছাই তৈরি করে নুনের অভাব আর চৈ দিয়ে ঝালের অভাব পূরণ - সব বুদ্ধিই কমরুনের।.... একদিন আসফাক জিজ্ঞাসা করেছিল, বনে তারা ভাত রুটি এসব খায় কিনা, খেলে কোথায় পায় ! তা থেকে সে এই দলটার জীবনযাত্রার পদ্ধতি আরও খানিকটা জানতে পেরেছিল। এরা লুকিয়ে-চুরিয়ে বন থেকে মধু সংগ্রহ করে, বছরে কোনো কোনো সময়ে এদের মোষ এত দুধ দেয় যে তখন তা থেকে মাখন তৈরি করে, ধনেশ পাখি পেলে তার চর্বি সংগ্রহ করে রাখে, বনে অনেক সময় হরিতকি বহেড়া ইত্যাদি ফল সংগ্রহ করে, প্রতি বছরই কয়েকটি করে মোষের বাচ্চা বিক্রি করে , সেই টাকা থেকে চাল, আটা, কাপড় কেনা হয়। এসব ব্যাপারে দলের যে কর্তা সেই সর্বেসর্বা।"[৫৯]

মহিষকুড়ার ভৌগোলিক অবস্থান ও নিসর্গ প্রকৃতি যেমন আমাদের পরিচিত গ্রাম ও শহর থেকে ভিন্ন, তেমনি এর মানুষজন তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা প্রচলিত উপন্যাসে অপ্রত্যাশিত, বিভূতিভূষণের আরণ্যক নয়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের অরণ্যের দিনরাত্রি নয়, এ এমন এক নিরবচ্ছিন্ন অরণ্যানী, যার সঙ্গে আমাদের চেনা দেশকালের যেন কোনো যোগ নেই।
বনের কোলে নিছক ঘুমিয়ে থাকা জনপদ নয়, অমিয়ভূষণ তাঁর উপন্যাসে চিহ্নিত করেছেন এক গভীর শৃঙ্খলা, এক অন্য অনন্য জীবনযাপন। তাঁর বর্ণনায় -

"অরণ্যের দুই রূপ আছে, এক রূপে সে আশ্রয় দেয়, অন্যটিতে সে প্রতিহত করে।... যারা বনের বুকে ফুটন্ত, কালো গরম পীচ ঢেলে সড়ক তৈরি করে, আর যারা লাঙ্গলের পিছনে ধৈর্য্য ধরে এগোয় তারা একই জাতের। আগুনে পুড়লে তবু আশা থাকে, ছাইয়ের তলা থেকে নবাঙ্কুর দেখা দেয়, লোভের

লাঙ্গলে পড়লে তেমন যে শালপদাতিকের নিরেট নিশ্ছিদ্র ব্যূহ, এক বনস্পতির এলাকা থেকে অন্য বনস্পতির এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত বিষমুখ কাঁটালতার তেমন যেসব ব্যারিকেড সব ধসে যায়।''[৬০]

অমিয়ভূষণ মানুষের হাতে অরণ্যনিধনের মর্মান্তিক ইঙ্গিত দিয়েছেন। লাঙ্গল শুধুমাত্র অগ্রগতির প্রতীক হয়নি, লাঙ্গল ধ্বংস করেছে বনাঞ্চলকে। বন কেটে তৈরি হয়েছে আবাদভূমি। মানুষের চাহিদার বাড়বাড়ন্তে উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত বনভূমি পরিণত হয়েছে চাষআবাদের জমিতে। অরণ্য কেটে তৈরি হয়েছে মানুষের বাসস্থান। 'মহিষকুড়ার উপকথা'য় অমিয়ভূষণ শিল্পের ভাষায় তুলে ধরেছেন বন ও জমির লড়াইয়ের কথা।

এক সময়ে কোচবিহার এবং ডুয়ার্স অঞ্চলে প্রচুর বেদে আর বেদেনি ঘুরে বেড়াত; মোষের বাথান ছিল অরণ্যভূমির এখানে-ওখানে। ডুয়ার্সের এই উৎকেন্দ্রিক বহতা জনজীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে লেখক নিপুণভাবে বর্ণনা করেন জঙ্গল, ঘাসবন, গজার মাছ, শাটি, চ্যাং ইত্যাদির সঙ্গে নেংটি-পরা মানুষজনের। অমিয়ভূষণ এ-প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

''আমি কোনো অঞ্চলের কথা বলতে চাইনি।.... পদ্মা থেকে শুরু করে কাঞ্চনজঙ্ঘা - এই ভূভাগ আমি এঁকেছি।''[৬১]

তিনি দেখিয়েছেন উত্তরের এ অরণ্য কখনো পালন করে, কখনো আবার ধ্বংস করে মানুষকে। কালো রঙের রাস্তা অরণ্যের বুক চিরে চলে। ব্রাজিল অরণ্যেও এভাবে দেখা দিয়েছে কালো রাস্তা বেয়ে লোভের অরণ্য-সংহার অভিযান।

এ উপন্যাসের মূল চরিত্র উত্তরবঙ্গীয় আসফাক উচ্ছেদ-হয়ে-যাওয়া হালুয়া বর্গাদার। তার বাপ মারা গেলে নতুন আধিয়ার আসে। আসফাক পালায়। বাউদিয়া দলের কমরুনকে পায় অরণ্যের সঙ্গিনী হিসেবে। কমরুনের স্বামী মারা যায় বসন্তে। আবার সেই কমরুন হয়ে ওঠে গ্রামের অর্থবান ব্যাপারী জাফরুল্লার চার নম্বর বিবি। ব্যাপারীর সন্তান দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আসফাক আর কমরুনের অরণ্যবাসের ফসল ফলে। বিচিত্র অরণ্য ও ভূমি-নির্ভর মানুষের সমাবেশ 'মহিষকুড়ার উপকথা' জুড়ে। উপন্যাসের শরীর জুড়ে ছোট আর বড় মানুষের মধ্যকার লড়াইয়ের কথা। অরণ্যকেন্দ্রিক আদিম প্রবৃত্তির টান। লেখক দেখতে পান উত্তরের এসব অরণ্যও দখল করে নিচ্ছে

ক্ষমতাবান লোভী মানুষেরা ঃ

> ''এতো বোঝাই যাচ্ছে শহরের রাজারা, যারা রাজ্য চালায়, তারা পোষ-না-মানা কোনো মর্দা মোষকে নিজের ইচ্ছামতো বনে চরতে আর কোনদিনই দেবেনা। যদিও হঠাৎ তোমার রক্তের মধ্যে এক বুনা বাইসন অঁ-আঁ-ড়া করে ডেকে ওঠে।' 'কেননা এতো বোঝা যাচ্ছে সব বনই কারো না কারো, যেমন সব জমিই কারো না কারো। হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য তুমি বুনা ষাঁড় মোষ হতে পার, কিন্তু বন আ বনের নয়, তাও অন্য একজনের।''[৬২]

আবার বনের সঙ্গে মনের সংযোগ খুঁজে পেয়েছেন এই অনন্য কথাশিল্পী। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন প্রকৃতির রূপ যেমন আমরা মানুষের মধ্যে দেখি, তেমনি আবার মানুষের রূপ আমরা প্রকৃতির ওপর আরোপ করি। প্রকৃতি মানুষের কাছে কখনো সহৃদয়, কখনো হিংস্র। আবার অরণ্যকে মানুষ বুঝতে চায় না, ঠিক যেমন বুঝতে চায় না নিজেদের মনকেই। অমিয়ভূষণ বন আর মনের সংযোগ প্রত্যক্ষ করেছেন।

অমিয়ভূষণ 'মহিষকুড়ার উপকথা'য় তুলে ধরেন ছোট ছোট ইতিহাস। তিনি জানান, ভোটমারিতে স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে ভুটিয়া দস্যুদের যুদ্ধ হয়েছিল, তুরুককাটায় নাকি মুঘলদের একটি ছোট বাহিনি ধ্বংস হয়েছিল, মহিষকুড়া ছিল বুনো মোষদের বিচরণস্থান।

এই উপন্যাসে আছে মহিষকুড়া বনের জীবন্তর কথা। বুনো মোষ, বাইসন ছাড়াও ক্রীড়াশীল হরিণ-হরিণী, শুঁড়-তুলে-ছুটে চলা হাতির পাল, আগুনের গোলার মতো লাফিয়ে পড়া বাঘ ইত্যাদি।

দুখিয়ার কুঠি ঃ 'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসটির কেন্দ্রভূমিতে উত্তরের যে জায়গাটি - তা হল চোরাবালিময় গদাধর নদীর পারে ছোট মহকুমা শহর গদাধরপুর, ঠিক ওপারে আদিবাসীদের গ্রাম দুখিয়ার কুঠি। গদাধরপুরের সঙ্গে সংযোগ রাখতে রাজধানী থেকে এগিয়ে আসছে পিচের রাস্তা। এই রাজধানী হল ব্রিটিশ বাংলার করদ রাজ্যের রাজধানী, অমিয়ভূষণ মজুমদার-এর বাসস্থান কোচবিহার। গদাধর নদের নিকটবর্তী মহকুমা তুফানগঞ্জের ছায়াপাত ঘটেছে গদাধরপুর নামের ক্ষুদ্র শহরের কল্পনায়।

> ''মহকুমা সদর গদাধরপুর। শহরের লোকসংখ্যা পাঁচশো ছিয়াত্তর।

মহকুমা-অধিপতির পদবি নাসের আহিলকর। তিনি রাষ্ট্রশক্তির প্রতিভূ হিসাবে শাসক এবং দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিচারক। স্বভাবতই তিনি শহরের কেন্দ্রস্থানে অধিষ্ঠান করছেন।"[৬৩]

'দুখিয়ার কুঠি'-তে পাই আমরা গদাধর নদীর পরিচয়। গদাধর নদীটি দশ-বারো হাত পরিসরের একটি জলধারা। এই নদীটি কিন্তু অগভীর খাতে বয়ে যাচ্ছে। বর্ষা ছাড়া অন্য সময় হেঁটে পার হতে হয়। মাঝে মাঝে চর দেখা যায়। সাদা চকচকে বালির চর। কোথাও বা সে চরে কাশ-কুশ-এর ঝোপঝাড়। আসলে এই চর চোরাবালি মাত্র। হাতিকেও গ্রাস করে এই চোরাবালি। তীরে বেতের ঝোপ অধিকাংশ জায়গায়। যেখানে বর্ষার জল পার ছাপিয়ে ওঠে সেখানে বনঝাউ ও শরবন। গদাধর নদীর নামকরণ প্রসঙ্গে বলা হয় দক্ষিণবঙ্গে যখন শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করছেন তার প্রায় সমসাময়িক কালেই আসাম ও উত্তরবঙ্গেও বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার হচ্ছিল, সাহিত্য গড়ে উঠছিল। বিভিন্ন মোঙ্গলীয় কৌমের যে লোকেরা এসে ভারতের পূর্ব-উত্তর অঞ্চলে অহম্ নাম নিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছিল, ধর্ম-চিন্তার ঐক্য দিয়ে তাদের একটি জাতিতে পরিণত করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংস্কৃতি পরিবর্তনেরও চেষ্টা হয়েছিল। উপাস্য বিষ্ণুর নাম থেকেই স্বাভাবিকভাবেই এই নদীর নাম হয়ে থাকবে।

এই উপন্যাসে আমরা এখানকার মানুষের দেহের গঠন আকৃতি ও পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা পেয়ে যাই। পাই সমাজজীবনের রীতিনীতির কথা। মাতালু নামক এক চরিত্রের চেহারা ও পোশাকের বর্ণনা পরিচয় আমরা পাই। পাহাড়িদের যেমন চেহারা তেমনই তার গেঁটে গেঁটে ডিম-ডিম পেশিযুক্ত হাত-পা। কিন্তু গড়টা দীর্ঘ। গায়ের রংটা তামাটের চাইতেও বরং হলদে বলা যায়। নাক ও ঠোঁট কিছু বিস্তৃত। চিবুকে ও উপরের ঠোঁটের প্রান্তে কয়েকটি করে চুল। কিন্তু ভ্রূ ও চোখদুটি বড়ো সুন্দর। ভারি সুরেলা তার কণ্ঠ। খালি গায়ে বুক খোলা ছিটের কোট, মাথায় জড়ানো লাল চৌখুপির নকশা তোলা এন্ডির চাদর। পায়ে থাকে রবারের জুতা। কুমরী আই-এর গঠন ও পোশাকের বর্ণনা আছে এখানে। তার পরনে হাঁটু পর্যন্ত সাদা মলমল, কাঁধ থেকে আঙুল পর্যন্ত অনাবৃত। তার গায়ের রং এখন সাদা নয় যতটা হলুদ। ভরা-ভরা মুখে ছোটো নাক কিন্তু সরু চোখ। হাত আর পাখানা অসাধারণ সুন্দর গড়নের।

আঙুলের গাঁটগুলো চোখেই পড়তে চায় না।

এই উপন্যাসে অমিয়ভূষণ নির্দিষ্টভাবে কোন জনজাতির কথা না বললেও অককরু, মাতালু, রংবর, কুমরী ইত্যাদি চরিত্রগুলিকে বোঝাই যায় যে তারা উত্তরবঙ্গেরর রাভা উপজাতি, রাজবংশী বা কোচ সম্প্রদায়ের মানুষজন। যেমন কুমরী (ডাঙ্গর আই)-এর জীবনযাপনে রাভাদের মতো মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

> ''ডাঙ্গর আই-এর অতীত জীবন প্রসঙ্গে রাজধানীর যে ঘটনার উল্লেখ আছে, তাতে আমরা লক্ষ্য করলে দেখব স্থানীয় ইতিহাসের ছায়াপাত ঘটেছে। এ অঞ্চলের লোকজীবনে বাংলা ভাষার যে রূপ প্রচলিত, লেখক মাটি-ঘেঁষা চরিত্রদের মুখে মোটের ওপর সেই বিভাষই দিয়েছেন। কাহিনিতে গোষ্ঠিজীবন আড়ালে চলে যায়নি। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব। ফলে নির্দিষ্ট অঞ্চল, দেশকাল ও সমাজের ছবি এবং ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে একটি সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীজীবনই প্রতিফলিত হয়েছে দুখিয়ার কুঠি-তে।''[৬৪]

অমিয়ভূষণ উল্লেখ করেছেন ভুটিয়াদের কথা। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যাদের নিবিড় সংযোগ ঃ

> ''প্রবাদ এই যে, ভোটদের এক অভিযাত্রী দল মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ অঞ্চলের সুবিস্তীর্ণ অরণ্যে আত্মগোপন করেছিল। তারা দেশে ফিরে যাবার জন্য উদ্যোগ প্রচেষ্টা করেছিল কিনা এ বিষয়ে বিতর্কের সুযোগ আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তারা গদাধর নদীর তীরে একখানি ভোট গ্রামের পত্তন করেছে। তখনকার দিনে সব জাতের সৈন্য দলের মতো এদের দলের সঙ্গেও কিছু পরিমাণে নারী ছিল, কিছু খচ্চর পনি ছিল, গ্রামের পত্তন হওয়ার পর নারীরা গৃহেরও পত্তন করল, এ বিষয়ে একটি সুবিধা ছিল যে এক নারীর পক্ষে পঞ্চস্বামীর ঘর করার বিধান ছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু অসুবিধা ছিল এই পুরুষরা চাষ-আবাদ করতে একেবারেই রাজী হল না, বরং কোমরে ঝোলানো দেড় হাত লম্বা তলোয়ার ও তীর ধনুকের সাহায্যে চারিদিকের গ্রাম থেকে প্রয়োজনীয় যা কিছু সংগ্রহ করাকেই তারা স্বাভাবিক মনে করেছিল। ... আর শেষ কথা এই যে পঞ্চস্বামীর ঘরের নারী বোধহয় কোন কারণে পঞ্চপুত্রবতী হয় না, বস্তুত ভোটদের লোকসংখ্যা বিশ বছর পরেও খুব একটা

বৃদ্ধি হয়নি, যদিও তাদের শস্যভান্ডার স্বরূপ গ্রামগুলিতে অনেক আদিবাসী নারীর সন্তানের আকৃতিতে ভোটত্বের ছাপ পড়েছিল।"[৬৫]

কথিত আছে, এক রাজকুমারের উপরে এ অঞ্চলের শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল। যত গ্রাম তত বন কিংবা বনই বেশি গ্রাম কম। আদিম বনের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথে যুক্ত এদিকে-ওদিকে ছড়ানো গ্রাম। সে-সময়ে উত্তরবঙ্গে ভোট বা ভুটিয়াদের কিছু প্রাধান্য হয়েছিল। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করত, ডাকাতি করত, রাজার সৈন্যদলের সঙ্গেও যুদ্ধ করত। এমনকি এক রাজাকে বন্দী করে ভোট দেশে নিয়েও গিয়েছিল। ইতিহাসকাহিনিতে শোনা যায় ভোটদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যই ইংরেজ কোম্পানির স্মরণ নিয়েছিল রাজা। কাজেই ধরে নেওয়া যায়, যার উপরে এ অঞ্চলের শাসনভার থাকত তার জীবনটা খুব একটা শান্তির ছিল না।

হলং মানসাই উপকথা ঃ এই উপন্যাসটির পাতায় পাতায় উঠে এসেছে উত্তরবঙ্গের জনপদ ও মানুষজনের কথা। একটি বিষয় খুবই লক্ষ্যনীয়, অমিয়ভূষণ মজুমদারের কথাসাহিত্য জুড়ে উত্তরবাংলার নদীগুলোর উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। 'হলং' এবং 'মানসাই' দুটোই উত্তরবঙ্গের নদী। এই নদীদের কেন্দ্র করে অরণ্যের ক্ষেত্রবিস্তার। অমিয়ভূষণ তুলে ধরেছেন সেই অরণ্যজীবনের কথা, যে অরণ্য 'ছোট হতে হতে প্রায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বনের নিবিড়তা এখন আর মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে না, ঘন অন্তরাল এখন লজ্জা নিবারণ করতে সমর্থ হয় না। বনের হিংস্রতা ছাপিয়ে মানুষের হিংস্রতা আরও প্রকট। সব বনই এখন কারও না কারও দখলে। লেদুমিঞা যে কিনা আসলে সমু, সমসের নাকি সমরেন, প্রাণপণ চেষ্টাতেও লেদুমিঞা থাকতে পারল না। পরিবর্তনের মহামন্ত্রে একদিন যাদের দীক্ষা হয়েছিল সেই বিশ্বাসের পৃথিবীটা হারিয়ে আজ সে ক্লান্ত। অনুতাপ কিংবা ভুল পথে দীর্ঘদিন চলার ক্লান্তি তাকে গ্রাস করেছে। গভীর নিঃসঙ্গতা তাকে পৃথিবীর কাছে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল, যে আশ্রয় হয়তো বা চন্দানি। বিশ্বাসের পৃথিবীটা কারো মধ্যে বেঁচে থাকুক এ তো প্রতিটি বিচ্ছিন্ন মানুষের বিশ্বাস। তারপর একদিন লেদু মিঞাকে গুলি খেয়ে মারা যেতে হল। অরণ্যের সাথে বাঘেরও যেমন শেষ আশ্রয় নষ্ট হয়ে যায়, এই সমাজে লেদু মিঞারাও তেমনি আশ্রয় হারিয়ে

ফেলছে।

''শেষ থাকিবার স্থান না পেয়ে শূন্যতার মধ্যে, অন্ধকারের নরকের মধ্যে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায়।''[৬৬]

শিবনারায়ণ রায় লিখেছেন ঃ

''হলং নদ না নদী, কোথায় তার উৎপত্তি, কী তার নামের অর্থ, কী তার ভূগোল ইতিহাস - সবই অনিশ্চিত। তবে সে যে নদ তা প্রমাণ করতেই যেন মাঝে মাঝেই মানসাইকে ছোঁবার জন্য তাতে মিশে যাওয়ার জন্য দিক বদলায়। বড় নদী মানসাই। আর এই উপকথাকে তারাই দিয়েছে রূপ, অর্থ, প্রাণ। পাশে আছে মানুষের তৈরি সড়ক, আর গ্রাম আর শহর। আর আছে হলং বন। সেখানে আশ্রয় নিয়েছে চন্দানি আর হলং নাগা। চন্দানিই এই উপকথার নায়িকা। তার মতো মেয়ে বাংলা সাহিত্যে বড় একটা চোখে পড়ে না। সরকারের শক্তির প্রতীক গজেন বাঘিলা, পশু নয়, ভূত নয়, খুনী লোভী নির্বিবেক গজেন বাঘিলা তাকে বলাৎকার করেছে। কিন্তু জয় করতে পারেনি। অরণ্য আশ্রয় দিয়েছে জীবনধর্মী চন্দানিকে। কারণ বনে বাঘ থাকে, দেও থাকতে পারে, কিন্তু খারাপ মানুষ 'বনৎ নাই থাকে'। তবে খারাপ মানুষ আসে, আসছে, মানুষের লোভের গ্রাস থেকে অরণ্যও হয়তো আর বাঁচবে না। কিন্তু অমিয়ভূষণের এই উপকথা হতাশার সুরে শেষ হয়নি। মানুষের পাতা জাঁতাকলে মারা গেল বাঘিনী। তার সদ্যপ্রসূত বাচ্চাদুটোকে দুহাতো আঁজলায় বয়ে নিয়ে এল হলং নাগা - চন্দানির পায়ের কাছে রাখল প্রাণের সেই আশ্চর্য উপহার।''[৬৭]

উত্তরবঙ্গ ভরে আছে এ উপন্যাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ঃ

''উত্তরের পাহাড়ে যে ঘন বন আর বনের নিচে লাল মাটি, সেই লাল মাটি চুঁইয়ে যে জল তা এক সময়ে ঝর্ণা, পরে দেখবে এই নদী, যে একা একা দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমিতে গুটি-গুটি এগিয়ে গিয়েছে... কেউ বলে এর নাম যে হলং তাই প্রমাণ করে এটা বন্যার আঙনে তৈরি হয়েছিল।'[৪৯]

হলং যেখানে বরং মানসাই-এর খুব কাছাকাছি, সেখানে একটা গ্রামের নাম উখুন্ডি।''[৬৮]

''হলং বন সম্বন্ধেও এরকম বলা হয়, বনটাই আদিম। মানসাই যাতে

ভূমিক্ষয়ের সাহায্যে উত্তরে সরতে না পেরে সেজন্যই বনটাকে রাখা হয়েছিল। বনের মধ্য দিয়ে সরু রাস্তা ছিল। পরে বাস ট্রাকের সড়ক করতে গিয়েই বন কাটা হচ্ছিল বারে বারে। সড়ক সরতেই বন আবার তার পুরনো জমি দখল করছিল। এ সেই হলং বনই, যেখানে বাঘ, গন্ডার, হরিণ থাকতো। লাল বাঁদর থাকতো বুনো ফল খেতে, বুনো ফলের বাগান ছড়াতে। শ্যাঁ বাঘও।"[৬৯]

"গাছগুলো বেশ বড়। শীতকালে ফুল হয়। তারও শ দুয়েক গজ দূরে এক সারি ইউক্যালিপটাস। ইউক্যালিপটাস সারি পাহাড়ী গাছগুলোর চাইতে উচ্চতায় কম হলেও তাদের মাথা আর পাহাড়ী গাছগুলোর মাথা সমান সমান উচ্চতার মনে হয় এপাশ থেকে। এই দু-সারি গাছের মধ্যে কাশ, ছন, লতাকুল তো বটেই, পাহাড়ী কলা এসব গাছও আছে, কাজেই বেশ ঘন বলেই মনে হয়।"[৭০]

"হলং কোনোটা না কোনোটায় চেপে ফালাকাটা ধূপগুড়ি এইসব দূরের শহরে চলে যায়।"[৭১]

"এখানে ঋতু বলতে শীত আর বর্ষা। শীত আর বর্ষার মধ্যে কয়েকদিন একফালি গ্রীষ্ম নামে।"[৭২]

(এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ায় এই বৈশিষ্ট্যটি ছিল মনে রাখার মতো। বৃষ্টি মানে একটানা বর্ষণ। থামতোই না সহজে। জল থইথই চারিদিক। স্বাভাবিকভাবে গরমকাল হলেও গরম বোঝা যেত না। আর শীত ছিল হাড়-কাঁপানো। গ্রীষ্মের অস্তিত্ব প্রায় ছিল না বললেই চলে। একটু গরম পড়লেই অবধারিতভাবে বৃষ্টি নামতো। ইদানিং বদলে গেছে উত্তরের আবহাওয়ার সেই ধরণ।)

সোঁদাল ঃ

অমিয়ভূষণের ছোট উপন্যাস 'সোঁদাল' জুড়েও উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপট।

"লেখক আমাদের যে গল্পের ভেতরে নিয়ে যান তার মূলকথা হল ধনতন্ত্রের চক্রান্তে আদিম সরলতা তার প্রেমপিপাসা নিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। মোন্নাত

অসুর উপজাতি কন্যা তিন্নির কাছে অরণ্যে আশ্রয় পেলেও তা চিরস্থায়ী হয়না। পিপাসা থেকে যায় জীবনের জন্যে। 'এক রাতিত জীবনের সোয়াদ মিটে?' এই আর্তরব ছড়িয়ে পড়ে হলুদ সোঁদাল ফোটা গহীন অরণ্য-গর্ভে। নিঃসঙ্গতার আর্তি পাঠককে জারিত করে, তা শতগুণে বেড়ে যায় যখন খোকনেন্দ্রগুন্ডার টেলিস্কোপিক রাইফেলের নলে মাটিতে লুটিয়ে পড়া মোন্নাতের কণ্ঠে অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় 'মহিসমোতি' কিংবা ইংরেজিতে 'মাই ওয়াইফ'।"[৭৩]

এই উপন্যাসেও উত্তরের নিসর্গের বর্ণনা বারবার উঠে এসেছে ঃ

"এই অঞ্চলে যেন যে বন্দী হয়ে গেছে, ... নদী থেকে হিসাব করলে দক্ষিণ পশ্চিমে হাতকাটা, মোটামুটি দক্ষিণে হাদলমারি, দক্ষিণপূর্বে লাউতামা। অবশ্যই স্থানীয় মানুষদের দেওয়া নাম। গ্রাম নয়, গ্রামগুলোর নাম হয়তো আখুরার হাট, দলদলি কিংবা টাঙ্গনমারি।"[৭৪]

"বনই তো। পথের দুধারেই ঘন গাছের সারি, শাল, সেগুন, কড়ি, গামহার। সেই সারির মধ্যে নেমে গেলেও বন চলতে থাকত অনেক জায়গায়।"[৭৫]

"যে লোকাল ট্রেনটা কাছের জংশন থেকে ছেড়ে সীমান্ত পর্যন্ত দুবার যায় ও দুবার আসে, যাতে সারাদিনেও কোনো স্টেশনে একটা বা দুটোর বেশি টিকিট কাটা হয় না, অথচ বিনা টিকিটের যাত্রীর চাপে ফেটে পড়তে চায়, তাকে বলা হয় হংকং এক্সপ্রেস। যেহেতু সেই ট্রেনগুলোর যাত্রীরা সকলে সীমান্তের ফ্রী ট্রেড জোনে যাওয়া আসা করে।"[৭৬]

"মোন্নাতের রায়ডাকের এই ফোঁসানো, ফুটন্ত, ফেনিল জল দেখার স্বপ্নটার খুব সহজ ব্যাখ্যা হয়।"[৭৭]

অমিয়ভূষণ এই ছোট উপন্যাসটির পরতে পরতে উত্তরবঙ্গের বনাঞ্চলের ছবি এঁকেছেন। গাছগাছালি ও মানুষজনের সম্পৃক্ত থাকবার কথা বলেছেন। বলেছেন অসুর গোষ্ঠীর কথা - যারা বনের সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নিয়েছিল প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে। অমিয়ভূষণের পর্যবেক্ষণে - এই মানুষেরাও যেন

হাজার বছরের চেষ্টায় বনের আধা-অন্ধকার শ্যামলতার সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নিতে পেরেছে। বনের প্রভাব পড়েছিল তাদের দেহের গঠনেও। লেখকের কথায় - একদল শ্যামল সাঁওতাল কি করে যেন এইসব বনে বাস করতে এসে নিজেদের জাতি বদলে ফেলেছে। উত্তরের এই বনের নিছক কাব্যিক শোভাই উল্লিখিত হয়নি এই উপন্যাসে; বাস্তবটাও তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। অমিয়ভূষণ বলেছেন - এইসব বন তপস্যার ভূমি বা শান্তির আলয় নয়, জীবন আর মৃত্যু এখানে পরস্পরের অলিঙ্গনে থাকে। বেঁচে থাকবার জন্য মানুষকে নিরন্তর লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। বন যেমন কখনো কখনো নিষ্ঠুর, বিশেষত উত্তরের ভয়ানক বর্ষায়, তেমনি স্নেহশীলাও বটে। তাই অরণ্যবস্তি বা অরণ্যঘেঁষা গ্রামগুলো বনের কোল ছাড়তে চায় না।

বন হাসিল করে চাষ-আবাদের ঝুঁকি নিতে পেছপা হয় না রাভাপুরুষ। জঙ্গলই তাকে শক্তি দেয়। সেখান থেকে সে বাঁশ, কাঠ, ছন এনে ঘর তোলে। অরণ্য কেটে তৈরি করে চাষের জমি। ধান খেতে শূয়োর আসে, শিং বাগানো বুনো মোষ আসে, পাহাড়সমান হাতির দল আসে - কিন্তু তাদের সামনে অকুতোভয় হয়ে তীর ধনুক টাঙ্গি বল্লম হাতে দাঁড়ানোর সাহস ও শক্তি তাদের প্রকৃতিই দিয়েছে। প্রকৃতি আর নারীকেও সমার্থক করে দিয়েছেন লেখক। অরণ্যপ্রকৃতি যেমন গঠন করে রাভাপুরুষের দৃঢ়তা, তেমনি নারীও তাকে অরণ্যে ঘর বাঁধার শক্তি ও প্রেরণা জোগায়।

এই উপন্যাসে রয়েছে উত্তরবঙ্গের বাথান-সংস্কৃতির কথা। বনের ধার ঘেঁষে থাকতো মোষের বাথান। কুড়ি পঁচিশ থেকে একশো দেড়শো মোষ যেখানে থাকতো। সেই সব বাথানের মানুষেরা কিছু ধানের জমি করতো। কিন্তু তাদের ব্যবসার মূল পণ্য ছিল মোষের দুধ আর মোষ। 'সোঁদাল'-এ এই প্রসঙ্গেই উত্তরের বনাঞ্চলের এক অন্য কথাও রয়েছে। বাথানের মোষের দল বনে ঘাসপাতা খেতে চলে যেত। সেখানে বাথানের মেয়ে-মোষের সঙ্গে শরীরী মিলন হত বনের মোষের। পোষা আর বুনোর মিলনে যে মোষ জন্মাত তার দাম অনেক বেশি হত গোহাটায়। পাশাপাশি অমিয়ভূষণ অন্য মিল দেখিয়েছেন। বাথানিয়ারা বনের কাছে চলে যেত বাথান নিয়ে। বনের কোলের স্থায়ী বাসিন্দাদের সঙ্গে তাদের দেখাসাক্ষাৎ অবধারিত। দুই গোষ্ঠীর নারী-পুরুষের মধ্যে মিলন হত। এই মিলনের ফলে জন্মানো সন্তানদের

চেহারাতে মিশ্র সংস্কৃতির ছাপ পড়ত।

উপন্যাসের শেষে উত্তরের অরণ্যপ্রকৃতির সঙ্গে অদ্ভুতভাবে মিলিয়ে দেন মোন্নাত আর তিন্নির অপরিশীলিত ভালবাসাকে। তিন্নির হলুদ শাড়ি কী নিবিড়তায় মিশে যায় আরণ্যক সবুজের সঙ্গে। গেরুয়া রঙধরা ঘাস, শাদা চিকচিকে নদীর বালি, নানান ধরণের জংলী সবুজ - কালচে সবুজ কলাপাতা সবুজ হরিয়াল সবুজ টিয়া সবুজ পান্না সবুজ - আর সাদাসহজ তিন্নির স্বপ্নহলুদ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। তিন্নির খোঁপায় মোন্নাত যখন অরণ্যের সোঁদাল গাছের ফুল গুঁজে দেয় তা এক অন্য মাত্রা পায়। সোঁদাল ফুলের সোনা হলুদ রঙ তিন্নিকে আরো প্রাকৃতিক করে তোলে। অমিয়ভূষণ আরণ্যক রক্তিম পাতা ও ফুলেদের বর্ণনা দিয়েছেন, নানা বৈচিত্র্যে অনবদ্য সেসব লাল। শালের পাতায় একরকম লাল, কলার থোপে সবুজের মধ্যে একটা মোচায় আর একরকম লাল, সামান্য শিমুল ফুল - তাও অন্যরকম লাল। তিন্নির হলুদ শাড়ি আর চাঁদালের হলুদ ফুল যখন অরণ্যপথে ক্রমে মিলিয়ে যেতে থাকে, গুলিবিদ্ধ মোন্নাতের শরীর থেকে ছিটকে বেরোনো লাল যেন একাকার হয়ে যায় উত্তরের অরণ্যের অনাবিল লালের সঙ্গে।

মধু সাধু খাঁ ঃ

নগর চতুরালির কেন্দ্রবিন্দু থেকে বহুদূরে অরণ্যঘেঁষা উত্তরবঙ্গে স্বেচ্ছানির্বাসনে তিনি সৃষ্টি করেছেন একের পর এক ধ্রুপদী কথামালা। প্রকৃত সাহিত্যিক জীবনবীক্ষার ভূমি থেকে রস আহরণ করেন। সাহিত্যিক সত্তার মনোভূমিতে 'পার্ট অব দ্য ল্যান্ডস্কেপ' থেকে উত্তরের প্রকৃতিকে অমিয়ভূষণ যেন সযত্ন আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে অনবদ্য সৌন্দর্য নিয়ে উঠে এসেছে উত্তরের প্রকৃতি। সে প্রকৃতিতে সযত্নে প্রোথিত তিস্তা-জলঢাকা-রঙ্গিতের সুতীব্র গর্জন, তুষারশৃঙ্গ হিমানীর ধবল গড়ন, তড়াগ-পল্বল সরোবরের জলের স্নিগ্ধতা। দলদলে কাদামাখা ভূমিতে অন্তেঃবাসী পরিশ্রমী মানুষের ঘাম, আনন্দ রমন। চোখে পড়ে শাল সেগুন শিশু শিরীষের ঋজুতা মাখা সবুজ জঙ্গল, ঘাসবন, কুলবন, ছোট নীল-হলুদ ফুলের মেলা। উত্তরের আকাশের গায়ে নীল মেঘের মতো পাহাড়। নীল

পাহাড় আবেগের ঢেউ বুকে হিমালয়ের দিকে এগিয়ে যায়। বনের গাছের মাথার উপর দিয়ে নীল মেঘের ঢেউয়ের মতো তার অবস্থান। উত্তরবঙ্গের অনেক অঞ্চলে গ্রাম আর বনের তফাৎ করা অসম্ভব। সে সব বন কোথাও এমন যেখানে দিনেও আলো হয় না। গাছগাছালি, মহীরূহ, বনস্পতি হাতি, গন্ডার, বনবরা, হরিণ, বুনো মোষ, বনমুরগী, সাপ থাকে। ঝরনা নদীর ছোট ছোট শাখা, বুনো ঘাস হয়। জলে শাপলা-শালুক-হোগলা-কাশের সমারোহ। এই সতেজ প্রকৃতি এক মহত্তর সাহিত্য সম্ভাবনার উন্মোচনে অমিয়ভূষণকে প্রেরণা দিয়েছিল। শক্তিশালী জীবনকাঠির পরশে শিল্পী তাকে অমর রূপ প্রদান করেছেন। সৃষ্টি হয়েছে এক প্রাকৃতিক রূপ চিত্রিত নন্দনশালা।

'মধু সাধু খাঁ' উপন্যাসে এক বিশাল প্রকৃতির প্রেক্ষাপট ধরা পড়েছে। তাম্রলিপ্ত হয়ে মুর্শিদাবাদ, উত্তরবঙ্গ হয়ে আসাম পর্যন্ত নদীপথের দুপাশের প্রকৃতি লেখকের কলমে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ঃ

> ''এটা অবশ্য গঙ্গা নয়, ধল্লা নাম।''[৭৮]

> ''চারণ তখন নৌকা ব্রহ্মপুত্র আড়াআড়ি পার হয়ে তিস্তার মুখে ঢুকতে চেষ্টা পাচ্ছে।''[৭৯]

> ''সেই অসম ভুটান পর্যন্ত যেতে চায়। কী লাভ ? বাণিজ্য করবে ? আ মরি, সে তো চেকাখাতার আরম্ভেই পাওয়া যায়। যা চাও, যত নিতে পারো। ভোট কম্বল, কস্তুরী আর চমরীর লেজ, আর সময়কালে সন্তরা।''[৮০]

> ''তা ধল্লার এ অংশটায় বড়ো বড়ো চর। অর্থাৎ গ্রামে যেতে হলে নৌকা রেখে বেশ খানিকটা বালির চর ভাঙতে হয়। কিন্তু পুরনো শিঙ্গিমারির দু-পারেও তো বন। নৌকা ধল্লার উপরে আড়াআড়ি চলে শিঙ্গিমারির সোঁতায় ঢুকে পড়লো। মজার নদী এই শিঙ্গিমারি। কোথাও ধল্লার সাথে যোগ, কোথাও মানসাই-এর সঙ্গে, অন্য কোথাও মজা দ। এঁকে বেঁকে কামতাপুরের ভিতরে বাইরে বয়ে গিয়েছে।''[৮১]

''ধুবড়ির ঘাটে মালের নাও এড়ে কালজানি রায়ডাকে না জিয়ে তোরষা মানসাই ধরে কিছু এগিয়ে এই ধল্লায় এসে পড়া।''[৮২]

''তুমি কিন্তুক কামতার প্রাচীর দেখে নিয়ো। চোখ সার্থক। আর হলোও ভালো। বাতাস ভালো পাই কাল প্রথম রাতেই চিলাপোতের খাল ঘুরে কালজানি পাড়ে তোমার চেচাখাতা।''[৮৩]

''নৌকা তাহলে মানসাই ঢুকেছে দু-মোহানা আড়াআড়ি পার হয়ে। বাতাস পাচ্ছে পালে। কিন্তু জল সব জায়গায় সমান গভীর নয়। ... নদীর পাড়ে বন, মাঝখানে চর। চর আর পাড়ের মধ্যে যেন ঠান্ডা জলের দ। সেই দহের নীল জলের উপরে চর ঘেঁষে নৌকা।''[৮৪]

''এবার ভাটিয়ে ব্রহ্মপুত্র উজিয়ে গুয়াহাটি। দু-দিকে চর। গত বর্ষায় নতুন খাত কাটার আগে এটাই খাত ছিল। দু-চরের মধ্যে এখানে স্রোতটা ঢিমে। জলটা নীলচে আর তার তলায় শেঁওলা কাঁপে। এ-নদীর জল আর ও-নদীর জল। জলের রঙ বদল হয় দেখো।''[৮৫]

''ওদিকে ধুবড়িতে রঘু আর এদিকে কামতাপুরের লক্ষ্মী। কিন্তু উপায় কী? তিন টুকরো, কিন্তু একই দেশ তো, না গিয়ে উপায় ? আর তাছাড়া নদীগুলো মেশামেশি না ? জলে-জলে একজন নয় ? বলো ? পূর্বস্থলী থেকে দেখো নৌকায়-নৌকায় গুয়াহাটি যায়।''[৮৬]

প্রকৃতির পাশাপাশি উঠে আসে উত্তরের ইতিহাসের নানান কথা ঃ

''এই কামতায় শুক্লধ্বজ, নীলাম্বর, বরবাক, তুবরাক খাঁয়েরা, শেষে হুসেন শা আর এখন নরনারায়ণ। কিন্তু ? বরবাক বা তুবরাক মারের চোটে করতোয়া বেয়ে পালিয়েছিল, গৌড়ে না পৌঁছে থামেনি। বারো বছরের চেষ্টায় হুসেন শা কামতাজয়ী, কিন্তু নিজ বেটা দানিয়েলকে দিল বেঘোরে। তারপর এখন নরনারায়ণ। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখো আর একে যৌবন পায়। ... ও দিকে দক্ষিণে ঘোড়াঘাটের আশেপাশে শাবাজ খাঁ মুগোল।''[৮৭]

''এই বংশেরই আগের বংশের শেষ রাজা ছিল নীলাম্বর এই কামতায়।

নীলাম্বরের এক রাণী বনমালা। মন্ত্রীর যুবক পুত্র মনোহর তাকে কৃষ্ণকীর্তন পড়ে শোনায়। মন্ত্রী শশী পাত্রের পুত্র মনোহর। হাতে-নাতে ধরা পড়লো একদিন মনোহর। রানী হলেও গোপন করা যায় না - যাকে বলে ব্যভিচার। ক্রমে সাহস বাড়ে তার তাতে অনর্থ। বিচারে মনোহরের প্রাণদন্ড। আর পূজা কামতায়। তিথিতে-তিথিতে নরবলি। একরাতের পূজায় মনোহরকে বলি দেওয়া হল, চান করিয়ে এনে ভিজে কাপড়ে হাঁড়িকাঠে ফেলে। কেউ বলে পৈতাসমেতই ছিল। তা না হলেও শশী পাত্র ব্রাহ্মণ, তার পুত্রও গোঁসাই হবে। সেই থেকে গোসানীমারী নাম।''[৮৮]

'মধু সাধু খাঁ' সারস্বত পত্রিকায় প্রথম প্রকাশ পায় অগ্রহায়ন ১৩৭৫-এ। মধু খাঁ এক বেনে, নিবাস পূর্বস্থলী, জাত কায়েত। মধু পিতার একমাত্র পুত্র সন্তান। তার দুই স্ত্রী। প্রথমার এক ছেলে তিন মেয়ে। বিরক্ত হয়ে পুত্রার্থে দ্বিতীয়াকে এনেছিল, কিন্তু তাতে কোন সুফল ফলেনি। অর্থ-যশ সব কিছু থাকা সত্ত্বে এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস খেলা করে মধুর রক্তের অন্তরালে। বংশের কেউই দীর্ঘজীবী হয়নি। মৃত্যুকালে তার পিতামহের বয়স চল্লিশ ছিল, তার পিতা প্রায় দীর্ঘজীবী হতে গিয়েও সাতচল্লিশে গত হয়েছে। খুড়ো মশায় পঁচিশে মৃত্যুলাভ করেন। মধুর নিজের বয়সও সাঁইত্রিশ হল। হয়তো বা ভাটির টান লেগেছে জীবনে। কিন্তু জেগে থাকে এক দুর্নিবার জীবনতৃষ্ণা। তাকে পাগলের মতো টানে 'বিবি সাহেব'। আকাশ মেঘলা হলে জলে যেমন সূর্যের বিম্ব ফোটে, কাঁপা-কাঁপা, ভাঙা-ভাঙা। কিন্তু ঠিক চেনা যায় না, যেন তেমন করে তার ভাবনার জলে বিবি সাহেবের সফেদ রঙ ফুটে ওঠে। ভালোবাসার এই শুভ্র সতেজ রঙই মধুকে যৌবনে একসাথে বেড়ে ওঠা নিজের কাকার ছেলেকে রক্তে রাঙানোর ব্যাপারে তরোয়াল তোলায়। ঘাই হরিণীর ডাকে হরিণ যেমন করে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়, ভালোবাসার হরিণী নারীর আশ্রয়ে তেমনি করে পুরুষ এগিয়ে আসে, তারপর একসময়ে শেষ হয়ে যায়। তবু ঘাই হরিণী না হলে হরিণের চলা অসম্ভব। বিবি সাহেবের সফেদ রঙ মধুকে টেনে নিয়ে যায়।

''অনেক রকমের আকাশ দেখা আছে মধুর সকালের। টুপ করে আলো নেবার পর যে অন্ধকার তারপরে নানা দিন নানা রঙের আকাশ হয়। লালে সোনালিতে মাখামাখি হয়, কখন যেন একবার লালে সবুজে মেশামেশি

ছিল। ... আবার এমন হয় শেষ রাতের চাঁদ ডুবতে না ডুবতে অন্ধকার। মেঘের ছায়ায় জল কালো। আর তার মধ্যে খুব ধীরে ধীরে বেরঙা আলো ফোটে। অবশেষে জলের মধ্যে স্রোতের পাঁকে ভাঙা ভাঙা বিবি সাহেবের মুখের মতো সফেদ ঠান্ডা ঝিকিমিকি সূর্য দেখতে পাওয়া যায়।''[৮৯]

'পুরুষ জীয়ে না' এই ধ্রুবপদ জীবনের সত্য মর্মান্তিক হলেও বুকের গহীনে জীবনের কি এক অনন্ত তৃষ্ণা, মধু হেসে বলে-

''ঘাইরা পালাতে দেয় না, তা দেবেই যদি, দল ভুলিয়ে আনা কেন ? কিন্তু এমত দৃশ্য দেখিছো আরু ? এমত প্রেম, এমত খেলা ? ''[৯০]

অথচ অন্ধকারে জলের স্রোত যেমন নৌকার গায়ে ঘা মারে, পাক খায়, নৌকার তলায়, সময়ের অন্ধকার তেমনি গ্রাস করে মধুকে। আবার চোখ দাও, আবার প্রাণ দাও এই প্রার্থনা মধুর অন্তরে বারবার আকুলভাবে ধ্বনিত হয়। সে জানে এই প্রার্থনা একমাত্র সার্থক হতে পারে নারীর মধ্যে, কারণ সেই তো আধার। ঘাই হরিণীর মতো মরণ ডেকে নিয়ে এলেও সেই তো একমাত্র সৃষ্টির জন্য রজস্বলা হবার ক্ষমতা রাখে। তাই তো মধুর অন্তঃস্থল কাঁপিয়ে প্রার্থনা ওঠে -

''ঈশ্বর নারীকে আশ্রয় করে আবার পৃথিবীতে এনো। আবার সূর্যকে দেখিবা দিহ। যে সূর্যের রঙ বিবি সাহেবের মুখের মতো ঝকমকে।''[৯১]

আসলে নারীর উষ্ণতার ওম পুরুষের চির আশ্রয় - অমিয়ভূষণ মজুমদার একথা বিশ্বাস করতেন। আর এই জন্যই উপন্যাসের শেষে মধুর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় -

''আর ভগবান, ভগবান যদি তেমত হয়, ছেলের বেটা কিংবা তস্য বেটা হয়ে এ দেশেতেই যেন জন্মাই যদি তেমন কিছু ঘটে যায়।''[৯২]

উত্তরবঙ্গ আর তার লাগোয়া আসামের নদীকেন্দ্রিক পটভূমি এ উপন্যাসে বিশেষভাবে প্রধান্য পেয়েছে ঃ

''নদীর স্রোত থেকেই তার মনে এল গত এক মাসে তারা ধুবড়িকে বাঁয়ে রেখে রাঙামাটি পর্যন্ত গিয়েছিল। ... তারপরে আবার ব্রহ্মপুত্র বেয়ে ধুবড়িকে (বলা চলে দুপুরি, হয়তো সে ঠিকই বলে) হ্যাঁ ধুবড়িকে ডাইনে ফেলে দক্ষিণে এসেছিল তারা। এখন ধল্লা বেয়ে কামতাপুরের দিকে চলেছে তারা। ভাগীরথী, ভৈরব, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্রের পরে এখন ধল্লা। পূর্বস্থলী থেকে কামতা, দক্ষিণ

থেকে উত্তর।"[৯৩]

"তার এই সরু লিকলিকে নৌকায়, তাকে কোষা কিংবা বাজরা বলো - বার্জ, দুই তোপ আছে। পিতলের আর তিন হাত লগা, আর মুখের ফাঁদ চার আঙুল। বাপের কালেই সূত্রপাত। এক অলিখিত অপরিণামদর্শী ব্যবসা। লাভলোকসানেরহিসাব করা যায় না, কাল-অকাল নেই, যদি প্রতিভা থাকে বুঝতে পারবে ব্যবসার মধ্যে কোথায় যে ব্যবসা ঢুকে পড়ে। মধুর পিতা এই রকম জ্যৈষ্ঠমাসেই এরই কাছাকাছি শেষ ত্যাগ করেছিল তীর বাঁধা অবস্থায় দু-রাত আর দুদিন কাটিয়ে। নৌকাটা এমন করেই উজানে চলেছিল কামতাপুরের বৈদ্যের কাছে পৌঁছানোর জন্য। এবার অবশ্য মধু খাঁ বরং বকুল আতর এনেছে।"[৯৪]

"দু-তিন দিন থেকেই কথা হচ্ছিল দুটো তোপ নৌকার একপাশে রেখে দাগলে নৌকা সামলানো যায় কিনা। গন্না বলেছিল পাল তুলে সাঁই-সাঁই করে বেরিয়ে যাব আর তোপদার নৌকার ডানপাশে দুই তোপ দাগবে। ধুবড়ির কাছে হাজারমণীর এক খোল পড়ে থাকতে দেখে মধু খাঁ বললে- ইখানেই হোক। কী যোগাড়যন্তর করে নৌকা পিছিয়ে এনে খোলটার পাশ দিয়ে ছুটবার আগে দেখা গেল বাতাসে জোর নেই। কী হবে আর, মারো দাঁড়। বারো দাঁড়ের ধাক্কায় ভাঁটার স্রোতে নৌকা ছুটেই চলল; আর তখন তোপ দাগল, সামনেরটি তোপদাহ, পিছনেরটি ফিরিঙ্গি ফিচ্। তোপের ধাক্কায় নৌকা বেশ ভাল রকমেই টলে উঠেছিল। কিন্তু গন্নার সুবিধা ছিল, সে জানতো টলবে। বাঁ বগলের নিচে হালের হাতল চেপে সে একবার সাম্হালো বলেই সামলে নিল। ফিরিঙ্গি ভাবল, মন্দ নয় যদি বড় জাহাজের থেকে এমন ব্রডসাইড দাগা যায় দশ-বারো কামানের।"[৯৫]

"এখন বেলা ডুবে আসছে, আর শরীরের রসাধিক্য, গন্না ধার ঘেঁষে নৌকা নিচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকাল মদু। ঠিক পুরনো শিঙ্গিমারির খাঁড়ির কাছে এসেছে তারা। হঠাৎ নৌকা দিক বদলাতে শুরু করল। হালের দিকে তাকাল মদু। হালটাকে আর একটু বাঁকাল গন্না। তার দৃষ্টি ওপারের কোনো বিন্দুতে।

কিছু একটা মতলব করেছে সে। কিছু কি দরকার হয়েছে তার ? তা ধল্লার এ-অংশটায় বড় বড় চর। অর্থাৎ গ্রামে যেতে হলে নৌকা রেখে বেশ খানিকটা বালির চর ভাঙতে হয়। কিন্তু পুরনো শিঙ্গিমারির দু-পারেও তো বন।"[৯৬]

"তখন সূর্য ডোবার আগের অবস্থা। পুরনো শিঙ্গিমারিতে ঢুকে পড়ল নৌকা বাঁ পাড় ঘেঁষে। ছোট ছোট গাছের জঙ্গল। শাল, কদম, ছাতনা। জঙ্গলটা পুরনো নয়, লতায় লতায় অগমও নয়। - এ এক মন্দ বন্দোবস্ত নয় - গন্না কোথায় নৌকা ভিড়াবে লাকড়ি অথবা চালের জন্য অথবা ঘি তেলের প্রয়োজন হলে - তা যেমন মদুর চিন্তার বিষয়ই নয়, তেমন মদু চেকাখাতায় যাওয়ার জন্য মানসাই-এ উজান না দিয়ে ধল্লায় কেন ঢুকল তাও গন্নার মাথা ঘামানোর ব্যাপার নয়। উজিয়ে চলেছে তারা, আবার ভাটিয়ে মানসাই ধরে উত্তরে যাওয়া যায়। নৌকা লোকগুলিকে নিয়ে কেন কোনদিকে যাবে তা মদু খা নিজে জানে। কোনদিকে যাবে তা যদি জানা যায়, বা, কেন বা যাবে, তা জানা অসম্ভব। ভাবাই সার হবে। মদুর পাতলা ঠোঁট খুবই চাপা।"[৯৭]

"প্রিয় পাঠিকা, গল্প হলেও এখানে একটা পরিচ্ছেদ শেষ করা যেত। কিন্তু নদীর উপরে পরিচ্ছেদ কোথায় ? কেউ ঘুমোচ্ছে, কেউ দাঁড় ফেলছে। একবার ক্যাঁচ করে শব্দ হল। হালটা একটু বেশি ঘুরালো কেউ। উপরে আর নীচে সময় আর জলের নদী। থামা কোথায় ? কারণ গন্নাই তখন হালে বসে ভাবছে কিছু একটা থাকতে পারে সেজন্য কামতাপুরের কাছে এসে পড়েছে তারা, হয়তো পিতার দহের থানাটাকে খুঁজে দেখা, কিংবা গোসানীমারির মন্দিরে মানত। তা মানত করলেই হল, মানত করার ব্যাপার। কিংবা ক্রমে বোঝা যাবে। হয়তো বকুল আতরের অছিলায় রাজদরবারে যেতে চায়। ধুবড়ির কাছে মত বদলাল না ? ধুবড়ির ঘাটে মালের নাও ছেড়ে কালজানি রায়ডাক নাগিয়ে তোরষা মানসাই ধরে কিছু এগিয়ে এই ধল্লায় এসে পড়া। যেন নদীগুলোকে নতুন চিনতে চায়। সোজা যদি কামতাপুরেই ঢুকবে তো শিঙ্গিমারি থেকে আবার ভাটিয়ে আসা কেন ?"[৯৮]

"বেলা ডোবার আগেই আহার শেষ করে মদু শুয়ে পড়ল। ফিরিঙ্গিকে ডেকে

বলল - আমি শুয়ে নিই। তুমি কিন্তুক কামতার প্রাচীর দেখে নিও। চোখ সার্থক। আর হলও ভাল। বাতাস ভাল পাইলাম। প্রথম রাতেই চিলাপোতের খাল ঘুরে কালজানি পাড় তোমার চেকাখাতা।"[৯৯]

"প্রথম রাতেই জলের ডাক শুনে বোঝা গেল মানসাই-ধল্লার মোহনায় এসেছে নৌকা। ছইকোঠার বাইরে এল মদু। চার-পাঁচ ঘন্টা দাপিয়ে দাঁড় ফেলে মাল্লারা এখন হাঁপাচ্ছে। তাদের একটু বিশ্রাম দরকার। তাছাড়া দুই পাগলা নদীর মোহনায় এক নদীতে ভাটিয়ে অন্যে যদি উজান ধরতে হয় চোখেও স্পষ্টাস্পষ্টি দেখা দরকার। এতক্ষণ তবু অন্য দুখানা নৌকা ছিল, আলোর ইশারা ছিল। এই অন্ধকারে জল চিনতে কী আর অসুবিধে। ডাঙা আর জল পৃথক রকম। কিন্তু জলের গভীরতা বোঝা যায় না।"[১০০]

"এই বংশের আগের বংশের শেষ রাজা ছিল নীলাম্বর এই কামতায়। নীলাম্বরের এক রানী বনমালা। মন্ত্রীর যুবক পুত্র মনোহর তাকে কৃষ্ণকীর্তণ পড়ে গেয়ে শোনায়। মন্ত্রী শশী পাত্রের পুত্র মনোহর। হাতেনাতে ধরা পড়ল একদিন মনোহর। রানী হলেও তো গোপন করা যায় না - যাকে বলে ব্যভিচার। ক্রমে সাহস পাড়ে আর তাতে অনর্থ। বিচারে মনোহরের প্রাণদন্ড। আর প্রাণদন্ডের অপরাধীর বলি এর আগেও হয়েছে চন্ডী-চামুন্ডার সামনে। রোজ পূজা কামতায়। তিথিতে-তিথিতে নরবলি। একরাতের পূজায় মনোহরকে বলি দেয়া হল। স্নান করিয়ে এনে ভিজে কাপড়ে হাঁড়িকাঠে ফেলে। কেউ বলে পৈতাসমেতই ছিল। তা না হলে শশী পাত্র ব্রাক্ষ্ণণ, তার পুত্রও গোঁসাই হবে। সেই থেকে গোসানিমারি নাম।
শুতে গিয়েও যেমন গন্নার মনে প্রশ্নটা উঠল - মতটা আবার বদলাল দেখ। রাঙামাটিতে কথা ছিল না, চেকাখাতায় যাওয়া সোজা মানসাই বেয়ে। ধুবড়িতে নাও, দেখে মত বদলাল, এল ধল্লা। এখন আবার চলেছে মানসাই-এর মোহনার দিকে।
"আর মুশকিল। এমন অন্ধকার কিছু ঠাহর হয় না। দক্ষিণের আকাশেও দেখো, তারা চোখে পড়ছে ? জ্যৈষ্ঠ শেষ আষাঢ় আগু। কিছু নজরে পড়ে না, নজিরও নেই। কী বললে ভাল হয় তা যেমন বোঝা যায় না, যা বলা হবে

তার কতটুকু বা বলা উচিত তা আগে থেকে জানার পথ নেই। .... মদু হাসল...। আর দক্ষিণের করতোয়া, ঘাঘট, মানস থেকে সরে এসে নৌকা ঝাঁক বেঁধেছে কামতাপুরের কাছে।[১০১]

''ট্যাবাকু ভালই। মদু কোঠা থেকে ট্যাবাকুর সাজ-সরঞ্জাম অনল। বদরের তৈরি চন্দনকুচি এখনো আছে কিছু থলিতে। মাটির সানাই ধোঁয়ায় এরই মধ্যে পেকে উঠেছে। সানাই-এর মুখে ট্যাবাকু আর চন্দন ভরে কোঠার কাঠের গায়ে হেলান দিয়ে বসল মদু। বদর তাকে একটু আয়েসিই করেছে। অব্যাস। কিন্তু এখনও যে ধল্লাতেই। এরপরে মানসাই তোরষা কালজানি হয়ে ব্রহ্মপুত্র, আবার সেখান থেকে ফিরে ধল্লায় আসা। তারপর বদর ফিরতে পারে, যদি ফেরা সম্ভব হয়।''[১০২]

''ভোর রাতেই কিন্তু আবার নৌকা ছাড়ল সে। এখন খানিক উজিয়ে, নদীর খাত যদি খুব বদলে না গিয়ে থাকে, তোরষা থেকে খালে খালে, বানিয়াখাল যার নাম, চিলাপোতার বাঁধানো খাল বেয়ে কালজানিতে পড়তে হবে। আর তা পড়তে না পড়তে চেকাখাতা। এখনও উজানে চলেছে নৌকা। খালের স্রোত কিন্তু কালজানির দিকে ভাটিয়ে যায়।''[১০৩]

''কথাটা কি ভুল বলল সে ? নৌকা দুটোর মাল্লারা, শুনে যেন হামলে উঠল। চিলাপোতার এই জলদুর্গ কি তাহলে নলরাজার অধীনে নেই ? চিলার অধীনে যারা যুদ্ধ করছিল তারা কি রাজাকে ছেড়ে চিলা রায়ের পথ নিয়েছে তবে ? কামতার বদলে ধুবড়ির প্রভাব ?''[১০৪]

''পিছনে দেখল মদু। এখন অন্য পক্ষ নৌকা ছাড়েনি। কালজানিতে পড়ার আগে আর কে ধরে ? আর যেখানে পড়লে, সেই চওড়া নদীতে, আর কে ধরবে ? টান দিয়ে কোঠার কাঠে বেঁধা ভাল্লাটা তুলল মদু। চকচকে না কিন্তু, কালো ইস্পাতের আর সূঁচের মতো চোখা এক হাত লম্বা ফলা - বিঁধলে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়।''[১০৫]

উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের দেহের গঠন ও পোশাক-পরিচ্ছদ

'অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'দুখিয়ার চিঠি' উপন্যাসে আমরা এখানকার মানুষের দেহের গঠন-আকৃতি ও পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা পেয়ে যাই। মাতালু নামক এক চরিত্রের চেহারা ও পোশাকের পরিচয় আমরা পাই। পাহাড়িদের যেমন চেহারা তেমনই তার গেঁটে গেঁটে ডিম ডিম পেশিযুক্ত হাত-পা। কিন্তু গড়নটা দীর্ঘ। গায়ের রংটা তামাটের চাইতেও বরং হলদে বলা যায়। নাক ও ঠোঁট কিছু বিস্তৃত। চিবুকে ও উপরের ঠোঁটের প্রান্তে কয়েকটি করে চুল। কিন্তু ভ্রূ ও চোখদুটি বড়ো সুন্দর। ভারি সুরেলা তার কণ্ঠ। খালি গায়ে বুক খোলা ছিটের কোট, মাথায় জড়ানো লাল চৌখুপির নকশাতোলা এন্ডির চাদর। পায়ে থাকে রাবারের জুতা। আদিবাসী মেয়ে 'কুমরী আই'-এর গঠন ও পোশাকের বর্ণনা আছে এখানে। কুমরী আই-এর পরনে হাঁটু পর্যন্ত সাদা মলমল, কাঁধ থেকে আঙুল পর্যন্ত অনাবৃত। তার গায়ের রঙ এখন সাদা নয় যতটা হলুদ। ভরা ভরা মুখে ছোট নাক কিন্তু সরু চোখ। হাত আর পা দুখানা অসাধারণ সুন্দর গড়নের। আঙুলের গাঁটগুলো চোখেই পড়তে চায় না। 'মহিষকুড়ার উপকথা'তে দৈহিক গঠনের কথা পাই। এখানে ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণ আসফাক-এর চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন। তার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ বছর। রোগা লম্বাটে হলুদ হলুদ চেহারা আর সকলের মতো কালো চেহারা নয়। চোখদুটো টেরচা, উপরের পাতা দুটো বড়ো মনে হয়। চিবুকে গোটা দশ-পনেরো চুল তার দাড়ির কাজ করে। এরা যে মোঙ্গল জাতিগোষ্ঠির মানুষ এবর্ণনায় স্পষ্ট।

উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা

অমিয়ভূষণের উপন্যাসে আমরা উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবনের কথা পাই। 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাসে আমরা অরণ্যনির্ভর মানুষের জীবনযাত্রার বিবরণ পেয়ে থাকি। সভ্যতার আগ্রাসনে পৃথিবীর আদিম কৌমার্য ছিন্নভিন্ন মলিন নতজানু হয়ে গেছে। তাই সভ্যতার অগ্রগতির অন্য নাম বোধহয় আগ্রাসন। মহিষকুড়ার চারদিকে যে বন সে বন এখন আর আদিম মানুষের

উত্তরবঙ্গের আদিবাসীদের দেহের গঠন ও পোশাক-পরিচ্ছদ

'অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'দুখিয়ার চিঠি' উপন্যাসে আমরা এখানকার মানুষের দেহের গঠন-আকৃতি ও পোশাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা পেয়ে যাই। মাতালু নামক এক চরিত্রের চরিত্রের চেহারা ও পোশাকের পরিচয় আমরা পাই। পাহাড়িদের যেমন চেহারা তেমনই তার গেঁটে গেঁটে ডিম ডিম পেশিযুক্ত হাত-পা। কিন্তু গড়নটা দীর্ঘ। গায়ের রংটা তামাটের চাইতেও বরং হলদে বলা যায়। নাক ও ঠোঁট কিছু বিস্তৃত। চিবুকে ও উপরের ঠোঁটের প্রান্তে কয়েকটি করে চুল। কিন্তু ভ্রূ ও চোখদুটি বড়ো সুন্দর। ভারি সুরেলা তার কণ্ঠ। খালি গায়ে বুক খোলা ছিটের কোট, মাথায় জড়ানো লাল চৌখুপির নকশাতোলা এন্ডির চাদর। পায়ে থাকে রাবারের জুতা। আদিবাসী মেয়ে 'কুমরী আই'-এর গঠন ও পোশাকের বর্ণনা আছে এখানে। কুমরী আই-এর পরনে হাঁটু পর্যন্ত সাদা মলমল, কাঁধ থেকে আঙুল পর্যন্ত অনাবৃত। তার গায়ের রঙ এখন সাদা নয় যতটা হলুদ। ভরা ভরা মুখে ছোট নাক কিন্তু সরু চোখ। হাত আর পা দুখানা অসাধারণ সুন্দর গড়নের। আঙুলের গাঁটগুলো চোখেই পড়তে চায় না। 'মহিষকুড়ার উপকথা'তে দৈহিক গঠনের কথা পাই। এখানে ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণ আসফাক-এর চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন। তার বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ বছর। রোগা লম্বাটে হলুদ হলুদ চেহারা আর সকলের মতো কালো চেহারা নয়। চোখদুটো টেরচা, উপরের পাতা দুটো বড়ো মনে হয়। চিবুকে গোটা দশ-পনেরো চুল তার দাড়ির কাজ করে। এরা যে মোঙ্গল জাতিগোষ্ঠির মানুষ এবর্ণনায় স্পষ্ট।

উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা

অমিয়ভূষণের উপন্যাসে আমরা উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবনের কথা পাই। 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাসে আমরা অরণ্যনির্ভর মানুষের জীবনযাত্রার বিবরণ পেয়ে থাকি। সভ্যতার আগ্রাসনে পৃথিবীর আদিম কৌমার্য ছিন্নভিন্ন মলিন নতজানু হয়ে গেছে। তাই সভ্যতার অগ্রগতির অন্য নাম বোধহয় আগ্রাসন। মহিষকুড়ার চারদিকে যে বন সে বন এখন আর আদিম মানুষের

আশ্রয়স্থল নয়। 'সব বনই কারো না কারো।' তাই বনের আশ্রয় নেওয়া আসফাক অরণ্যের মতো সবল হয়ে থাকতে পারে না। লটা ঘাস, কুশ বন আর নীল মেঘের মতো পাহাড়ে যে সব সবল মর্দা মোষ প্রাণশক্তিতে দুর্বার হয়ে ওঠে তা আসফাকের জীবনীশক্তি হয়ে ওঠে না। সভ্যতা যেন তাকে বলে 'দূরে যাও, আড়ালে যাও, এখানে কিছু নেই।' তারপর এলো কমরুন, নদীর জলে 'স্নানরতা সকালের চকচকে আলোয় নিরাবরণ'। এক বাঁকে ভরা জলে মেয়েমানুষের শরীর। কিন্তু যখন 'গরম পীচ ঢেলে সড়ক' তৈরি হয় তখন কিছুই আর অরণ্য মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এক বলবান সমাজের কর্তৃত্বের মুঠোর ভেতর সব কিছু চলে যায়। তাই কমরুন নির্বীর্য জাফরের 'বিবিসাহেবা'। জাফরের 'প্রভুসুলভ আধিপত্য ও পরাক্রম আসফাককে ক্রমশ নীরক্ত নির্বীর্য করে চলেছে।' নির্বীর্য জাফরকে বীর্যবন্ত করে তোলার জন্য আসফাক ওষুধ আনতে গিয়ে অরণ্যে পথ হারায়। সে তখন আবার আদিম মানুষ। তার রক্তে যেন বুনো বাইসন আঁ-আঁ করে ডেকে ওঠে। কিন্তু আসফাক পরাজিত হয়, কমরুনকে ছিনিয়ে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'মধু সাধু খাঁ' উপন্যাসে আমরা এক শ্রেণির মানুষকে খুঁজে পাই, যাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় নৌকা চালিয়ে। গন্না ও মদু সা দুটি চরিত্র, যারা নৌকা নিয়ে 'শিঙ্গিমারির খাড়ির' কাছে আসে। এখানে এসে নৌকার দিক বদলায়। হাল বাঁকিয়ে গন্না ধল্লার পাশ দিয়ে যায়, যেখানে বড়ো বড়ো চর। অর্থাৎ গ্রামে যেতে নৌকা বেশ খানিকটা বালির চর ভাঙতে হয়। এই পুরনো শিঙ্গিমারির দুপাশে বন। নৌকা ধল্লার উপরে আড়াআড়ি চলে সোঁতায় প্রবেশ করে। মজার নদী এই শিঙ্গিমারি। এঁকে বেঁকে ভিতর ও বাইরে বয়ে চলে। যেন ঘাসের জঙ্গলে প্রকান্ড ময়াল। নৌকায় যেতে যেতে দু-পাশে দেখা যায় শাল, কদম, ছাতনার জঙ্গল। এখানে আছে ছোট ছোট গাছের জঙ্গল। এখানে আমরা দেখতে পাই নৌকায় যেতে যেতে হরিণ শিকারের চিত্র। গন্না আর মদু নৌকায় যেতে যেতে হরিণ ও হরিণীকে দেখে। হরিণটা গলা লম্বা করে হরিণীর মুখের কাছে চাটবার চেষ্টা করছে। হরিণীটাই বরং বড় আর উঁচু । অস্পষ্টভাবে যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হল হরিণটার মাত্র দু

শিং গজিয়েছে। গন্না হরিণটা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়তেই হরিণটা লাফিয়ে ওঠে, দ্বিতীয় তীরটা বিঁধে মেরুদন্ড আর পেটের মাঝে। মাল্লারা হরিণটাকে টেনে এনে নৌকায় তোলে। এই উপন্যাসে আমরা শুধু নদ-নদীর কথা পাই। শুধু নদ-নদীর বুকেই মানুষের যাতায়াত। গন্না নৌকার হাল ধরে থাকে। এক সময় তার মনে হয় কামতাপুরের কাছে এসে গেছে। নৌকায় থাকা মানুষেরা হরিণ মেরে হরিণের মাংস আগুনে ঝলসে খায়। আবার এই নৌকায় থাকা মানুষগুলো নদীতে জাল ফেলে মাছ ধরেও খেয়েছে। নৌকার মধ্যেই রান্না হয়েছে মৌরালা মাছের ঝোল আর ভাত। অতি সাধারণ খেটে খাওয়া এইসব মানুষের জীবনযাত্রা।

'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসেও আমরা পাই সাধারণ মানুষের কথা। এখানকার মানুষ নৌকা পারাপার করে জীবিকা নির্বাহ করে। আবার বনের ইজারাদাররা নদীর উপর বনের বাঁশ কেটে সাঁকো বানিয়ে তার উপর দিয়ে যাওয়া যাত্রীদের কাছ থেকে চার পয়সা করে পারানি নিয়ে থাকে। এই দুখিয়ার কুঠির মানুষ দুধ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। মাতালু শহরের কয়েকটি বাড়িতে দুধ জোগান দিত এবং শহরের মিষ্টির দোকানেও দুধের জোগান দিত। এখানে আছে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। হেরম্ব চরিত্রটি ব্যবসাকে অবলম্বন করে দুখিয়ার কুঠিতে উপস্থিত হয়েছিল। সে গ্রামের লোকের কাছ থেকে অল্প দামে ধান কিনত এবং তার একটু বেশি দামে শহরে বিক্রি করত। আস্তে আস্তে সে মহাজন হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। দুখিয়ার কুঠি গ্রামের ভাটিয়াদের আনন্দিত হতে দেখা যায় নতুন রাস্তা তৈরির খবর নিতে। পথের অগ্রগতিতে দেশের প্রশাসন-ব্যবস্থাও সচেতন। তাই দেখি রাষ্ট্রপালক নিজে এরোপ্লেনে করে এসেছেন রাস্তা তৈরির খবর নিতে। কিছু মানুষ দাম চড়িয়ে বিক্রি করে। মাতালু ছাড়াও গ্রামের অন্যান্য দুধ-ব্যবসায়ীরা গ্রামে আসে দুধ বিক্রি করতে। আন্তাজ নামক ব্যক্তির কথায় কাঁকরুও দুধ বিক্রি করতে রাজি হয়। কিন্তু কাঁকরুর দুটি শিশু। তার স্ত্রী আপত্তি তুলেছিল দুধ বিক্রি করতে। এরা এতই দরিদ্র যে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম খাদ্য এদের নেই। এক টুকরো জমি পর্যন্ত নেই, যা ছিল তা ওই নতুন রাস্তা গ্রাস করেছে। সংসারে একটু সচ্ছলতা আনার জন্য পাখি শিকার করে বাঁটুল নিয়ে আবার কোনো কোনো সময় কেঁচো নিয়ে মাছও ধরে। এখানকার খেটে-খাওয়া

মানুষ গদাধর নদীর বুক থেকে শাক আর মাছ সংগ্রহ করে শহরে যায় বিক্রি করতে। এই সংগ্রহ ও বিক্রি করে অনেক মানুষের সংসার চলে। সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, নুন এরা এখান থেকেই পেয়ে থাকে। এখানকার মানুষেরা চোলাই মদের কারবার করে থাকে। কোনো কোনো বাড়িতে দেশীয় প্রথায় মদ তৈরি হয়ে থাকে। সাধারণত বয়স্ক ব্যক্তিরা মদের ব্যবহার করে থাকে। অন্যান্য অঞ্চলের আদিবাসীদের মতো ততটা মাছ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত নয়। প্রৌঢ়ত্ব পার হতে হতে স্ত্রী কিংবা পুরুষ যখন নিজের উষ্ণতা কমে যাচ্ছে বলে অনুভব করে, তখন তাদের কেউ কেউ বল বা শক্তি বাড়ানোর জন্য কিছু কিছু মদ চোলাই করে।'

আদিবাসী ও তাদের জীবনযাত্রা

'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসে আমরা বেশ কিছু আদিবাসী চরিত্র দেখতে পাই। কাঁকরু, মাতালু, রংবর, কুমরী ইত্যাদি এখানে আদিবাসী চরিত্র। এ অঞ্চলে রাভা উপজাতি ছাড়া তপশিলিভুক্ত রাজবংশী ও কোচ সম্প্রদায়ের আধিক্য দেখা য়ায। তবে এই চরিত্রগুলি ঠিক কোন সম্প্রদায়ের তা সঠিকভাবে উল্লেখিত হয়নি উপন্যাসে। ডাঙ্গর আই-এর জীবনযাত্রায় রাভাদের মতো মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রভাব বিদ্যমান। ডাঙ্গর আই হয়তো কোচ, মেচও হতে পারে।

আদিবাসীদের অসহায়তা পরিস্ফুট এই 'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসে। আদিবাসী কাঁকরুর ছ-সাত বিঘা জমি ছিল। সড়কের গতিপথের তলে তার অধিকাংশ জমির সঙ্গে তার ভাগ্য চাপা পড়েছে। উন্নয়নের ধাক্কায় কাঁকরু আজ নিজ গ্রামেই ভূমিহীন। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সে অসহায় হয়ে পড়ে। 'দুখিয়ার কুঠি'তে দেখি কখনও জমি এগিয়ে এসে গ্রাস করে বনকে, আবার বন কখনও জমিকে। কিন্তু সভ্য মানুষের লোভ সীমা ছাড়িয়ে উঠলে কাঁকরুরা অসহায় হয়ে পড়ে। কাঁকরু অবশ্য নিজস্ব পদ্ধতিতে বাঁটুল নিয়ে গোয়ালের কাছ থেকে একাই লড়াই করেছে। প্রতিবাদকে অবহেলা করতে কর্তৃপক্ষ অভ্যস্ত, বাধা পেলে তারা আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। কাঁকরুর বন্ধু মাতালু অবস্থাপন্ন আদিবালী নারী ডাঙ্গর আই-এর একমাত্র সন্তান। ভাটিয়া অর্থাৎ বহিরাগত উচ্চ বর্ণের কন্যা মালতীকে সে ভালবাসে। গোঁসাই বাড়ির মেয়ে মালতী

ছিল তার শৈশবের খেলার সঙ্গিনী। এদিকে সভ্য ভাটিয়ারা আদিবাসীদের নিম্নস্তরের মানুষ বলে মনে করে। মাতালু জানে, এতখানি সামাজিক দূরত্ব পেরিয়ে সে মালতীকে পাবে না। আর এত সামাজিক দূরত্ব সে অগ্রাহ্যও করতে পারে না। তবুও মালতীর অনুরোধ কখনও সে অগ্রাহ্য করেনি।'
'দুখিয়ার কুঠি' উপন্যাসে উত্তরবঙ্গের ভাটিয়া-দের সম্পর্কে জানা যায়। কোনো এক সময়ে যুদ্ধে জয়ী হয়ে ভাটিয়ারা প্রচন্ড শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাদের বিরুদ্ধে বাধা দেবার কথা আর চিন্তা করতে পারেনি উত্তরবঙ্গের আদিবাসীরা। ভাটিয়াদের রক্তে এখন আর সেই শক্তি নেই। কিন্তু নির্মমভাবে এগিয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা আছে। যার ফলে তারা বুঝে না বুঝে নির্দয় ব্যবহার করে থাকে।

'মধু সাধু খাঁ' উপন্যাসে আমরা গোসানীমারী দেবীর সম্পর্কে প্রচলিত গল্পের কথা পাই। নীলাম্বর নামে এক রাজা ছিলেন, যার এক রাণীর নাম বনমালা। মন্ত্রীর যুবক পুত্র মনোহর তাকে কৃষ্ণকীর্তন পড়ে ও গেয়ে শোনায়। মন্ত্রী শশী পাত্রের পুত্র এই মনোহর। এই মনোহর একদিন হাতে নাতে ধরা পড়ল। রানী হলেও গোপন করা যায় না ব্যভিচার। ক্রমে ক্রমে তাদের সাহস বাড়ে। আর তার থেকেই সৃষ্টি হয় অনর্থ। রোজ পূজা হয় কামতায়। তিথিতে তিথিতে নরবলিও হয়। এক রাতে পূজায় মনোহরকে বলি দেওয়া হল। স্নান করিয়ে এনে ভিজে কাপড়ে হাড়িকাঠে ফেলে। কেউ বলে পৈতাসমেতই ছিল। তা না হলে শশী পাত্র ব্রাহ্মণ, তার পুত্রও গোঁসাই হবে। সেই থেকে গোসানীমারী নাম।

অমিয়ভূষণের উপন্যাসে উত্তরবঙ্গ এক চিরকালীন ব্যাপ্তিতে ধরা পড়েছে। এখানে তিনি ধরে রেখেছেন এখানকার জনজাতিদের কথা, তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, জীবনযাপন, নগরসংস্কৃতির প্রভাব, প্রকৃতির নানা চিত্রমালা। 'মহিষকুড়ার উপকথা-য় আমরা পাই রাজবংশী জনগোষ্ঠীর জীবনকথা; কিন্তু তারই মধ্যে মূল চরিত্র চাউটিয়া বর্মণ-এর মধ্য দিয়ে আবহমান প্রবহমান জীবনের ছবি তিনি এঁকেছেন। এখানে কোচবিহারের দেশীয় রাজ্য ও সামন্ত প্রবাহের বিষয় উত্থাপিত হয়েছে। নয়নতারা, শ্রীগড়খন্ড-তে ধরা পড়ে

উত্তরবঙ্গের ফিউডাল ক্ষয়িষ্ণু জোতদারের কাহিনি। উত্তরবঙ্গে আশ্রয় নেওয়া ছিন্নমূল মানুষদের কথা তাঁর উপন্যাসে বিশেষ প্রধান্য পেয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এসেছে উদ্বাস্তু সমস্যার প্রসঙ্গ। গড়শ্রীখন্ড, দুখিয়ার কুঠি, মহিষকুড়ার উপকথা-তে নিরন্ন, নিরাশ্রয়, অবহেলিত উদ্বাস্তু মানুষজনের কথা বারবার প্রতিফলিত হয়েছে।

আছে আগ্রাসনের প্রসঙ্গ। নগর-সভ্যতার আগ্রাসন, ক্ষমতালোভীর আগ্রাসন। তার প্রকোপে কীভাবে উত্তরবাংলার অরণ্যবাসী অরণ্যনির্ভর মানুষ প্রবলতর সংকটে। কবি জীবনানন্দ দাশ-এর কবিতা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মনে আসে-

> "পৃথিবীতে সুদ খাটে, সকলের জন্য নয়
> অনির্বচনীয় হুন্ডি একজনের দু'জনের হাতে
> পৃথিবীর এইসব উঁচু লোকদের দাবি এসে
> সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়
> বাকি সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন
> কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়।"[১০৬]

মহিষকুড়ার চারদিকে যে বন সে বন এখন আর আদিম মানুষের আশ্রয়স্থল নয়, সব বনই কারো না কারো। ছ'বিঘা জমি চাষ করতো আসফাকের বাবা। জমির মালিক বুধাই রায়। বাবার মৃত্যুর পর আসফাক শুনেছে এবার সেই জমিতে আধিয়ার বসাবে বুধাই। প্রথমে জমি তারপর নিজের ঘরবাড়ির সঙ্গে সঙ্গে স্নেহ মমতার সমস্ত বন্ধন, সমস্ত আশ্রয় হারিয়ে গেল আসফাকের জীবন থেকে। বাস্তুহীন, আশ্রয়হীন, নিঃসঙ্গ আসফাকের সেই পথে নামা, তাই বনে আশ্রয় নেওয়া আসফাক অরণ্যের মতো সবল হয়ে থাকতে পারে না। লটা ঘাস, কুশবন আর নীল মেঘের মতো পাহাড়ে যে সব সবল মর্দা মোষ প্রাণশক্তিতে দুর্বার হয়ে ওঠে তা আসফাকের জীবনীশক্তি হয়ে ওঠে না। সভ্যতা যেন তাকে বলে - দূরে যাও আড়ালে যাও এখানে কিছু নেই। ফলে তীব্র ক্ষুধার পীড়নে অন্যের জমি থেকে শশা ফলমূল খেতে হয়েছে তাকে। যেতে যেতে বনের ধারে তাঁবু খাটানো একদল বেদের সাথে সাক্ষাৎ হল, সেখানে আবিষ্কার করলো তার চেয়ে ছয় সাত বছরের বড় কমরুনকে। সদ্য স্বামী বিয়োগ হয়েছে তার। দলের অন্য সবাই বসন্তের ভয়ে তাকে ফেলে পালিয়েছে। উন্মীলিত আর একটা জীবন । দুটি জীবনই তখন সব হারিয়ে

বসে আছে। তারপর এলো সেই সন্ধিপূজার লগ্ন। যেদিন নদীর জলে কমরুনের শরীর দেখলো সে, 'সকালের চকচকে আলোয় নিরাবরণ এক বাঁকে ভরা জলে চকচকে মেয়ে মানুষের শরীর'। স্বপ্ন দেখে দুজনই। কমরুন নিজের সত্তায় আসফাককে প্রোথিত করে আশ্বাস দেয় বুঝি বা নিজেও আশ্বাস পেতে চায়।

কিন্তু যখন 'অরণ্যে গরম পীচ ঢেলে সড়ক' তৈরি হয়, শুরু হয় আগ্রাসন। তখন কিছুই আর অরণ্য মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এক বলবান সমাজের কর্তৃত্বের মুঠোর ভেতর সব কিছু চলে যায়। চলে যায় কমরুনও, বীর্যহীন জাফর-এর বিবিসাহেবা হয়ে। আর জাফরুল্লার প্রভুসুলভ আধিপত্য ও পরাক্রম আসফাককে ক্রমশঃ নীরক্ত নির্বীর্য করে চলেছে। সে অধিকারবোধ থেকে সরে গিয়ে একাকী হয়ে যায়। অসহায় হয়ে পড়ে, হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ। আবার নির্বীর্য জাফরকে বীর্যবন্ত করে তোলার জন্য আসফাক অসুধ আনতে গিয়ে অরণ্যে পথ হারিয়ে আদিম মানুষ হয়ে যায়। তাই সে মর্দা মোষের মতো ডাক দিতে দিতে বনবাদাড় ভেঙে ছোটে। রক্তের মধ্যে যেন বুনো বাইসন আঁ-আঁ-ড় করে ডেকে ওঠে। কিন্তু সে ডাক ব্যর্থ হয়ে যায়। সভ্যতা উপস্থিত করায় কালো লেল্যান্ডের ট্রাক। এক মানুষ দেওয়াল তোলা, কাঁধ উঁচু উঁচু চাকা, কুচকুচে কালো রঙয়ের কলের মোষ। বনের মোষের সাথে তার লড়াই-এর সাধ্য নেই, আসফাক পরাজিত হয়, কমরুনকে ছিনিয়ে নিয়ে নতুন জীবন শুরু করা তার সম্ভবপর হয়না। আনিম কৌম জীবন সভ্যতার পাকা সড়কের কাছে পরাজিত হয়ে অসহায় নিঃসঙ্গতায় ভোগে। এ দ্বৈরথ অসম। তাই নিঃসঙ্গ আসফাক জাফরুল্লা ও তার সঙ্গীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

কোচ, রাভা জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক সঙ্কট এবং তার ফলশ্রুতিতে নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতার জন্ম। উত্তরবঙ্গের আদিম জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক ইতিহাস সম্বন্ধে অমিয়ভূষণের প্রবল আগ্রহ ছিল বলেই এই আদিম জনগোষ্ঠীর কৌম জীবনকে অঙ্গে ধারণ করে রচনা করেছেন 'মাকচক হরিণ' উপন্যাস। উপনিবেশোত্তর জনজীবনে কৌম সত্তা তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলতে বাধ্য; নগরায়ন সে সত্তাকে সামগ্রিক এক ধ্বংসের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে। হা-সাম (পৃথিবী, তৃণ, তৃণাচ্ছন্ন ভূমি) নারী হারিয়ে নিঃসঙ্গ রাভা-জীবন।

উত্তরবঙ্গের রাভা অধ্যুষিত একটি গ্রাম 'হাতিতল্লি জোড়া', সেখানকার রাভা জনজীবনে পরিবর্তনশীল কালস্রোতে নেমে এসেছিল সঙ্কটের কালো মেঘ। রাভা জনসমাজে মেয়েরা জমির মালিক, কিন্তু লাভের বাস্তবতাকে মানতে গিয়ে রাভা পুরুষেরা নিজ ধর্ম ছেড়ে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করেছে। গোত্র সমস্যায় বিবাহযোগ্য কন্যা না পাওয়ায় দলে দলে রাভারা আসাম প্রদেশে অন্য রাভাদের খোঁজে দেশ ত্যাগ করেছিল, ফলে তাদের ভাষা-সংস্কৃতি, বাংলা, ইংরেজী, রাজবংশী ও অন্যান্য ভাষা-সংস্কৃতির নীচে চাপা পড়ে হারিয়ে যাচ্ছিল। সামগ্রিকভাবে দেখলে এ হল কৌম গোষ্ঠীর অধিকার বোধ হারিয়ে ফেলার ইতিহাস।

আর 'বিনদনি' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জন কেইঝ যার আসল নাম গলাদন। গোপালগঞ্জের ব্যাপটিস্ট মিশন হাউস যাকে নিজস্ব রাভা সংস্কৃতির ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত করেছিল। জোন ম্যাডাম যাকে শিখিয়েছিল ভাষা শুধু চিন্তাকে ধরে রাখে না, জাতির ব্যক্তিত্ব আর ব্যক্তিত্বের অবস্থান কোথায় তাও ধরে রাখে। একটা জাতির মৃত্যু আর একটি ভাষার মৃত্যু প্রায় একই কথা। সেই রাভা ভাষা যখন সভ্যতার তথাকথিত অগ্রগমনে আর অবিকৃত রইল না, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্ঠধর্ম যখন রাভাদের প্রাচীন অবস্থান থেকে সরে আসতে বাধ্য করল, জন্ম নিল এক অসহায় সংস্কৃতিহীন বেদনা, আদিম সংস্কৃতিহীন এক আধুনিক শূন্যতা।

'হলংমানসাই উপকথা' সেই অরণ্য-জীবনের কথা, ছোট হতে হতে যা প্রায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বনের নিবিড়তা এখন আর মানুষকে আশ্রয় দিতে পারে না, ঘন অন্তরাল এখন লজ্জা নিবারণ করতে সমর্থ হয় না। বনের হিংস্রতা ছাপিয়ে মানুষের হিংস্রতা আরও প্রকট। সব বনই এখন কারো না কারো দখলে। লেদু মিঞা যে কিনা আসলে সমু, সমসের নাকি সমরেন, প্রাণপণ চেষ্টাতেও লেদু মিঞা থাকতে পারল না। পরিবর্তনের মহামন্ত্রে একদিন যাদের দীক্ষা হয়েছিল সেই বিশ্বাসের পৃথিবীটা হারিয়ে আজ সে ক্লান্ত। অনুতাপ কিংবা ভুল পথে দীর্ঘদিন চলার ক্লান্তি তাকে গ্রাস করেছে। গভীর নিঃসঙ্গতা তাকে পৃথিবীর কাছে আশ্রয় নিয়ে বাধ্য করেছিল, সে আশ্রয় হয়তো বা চান্দনি। বিশ্বাসের পৃথিবীটা কারো মধ্যে বেঁচে থাকুক্ এ তো প্রতিটি বিচ্ছিন্ন মানুষের বিশ্বাস। তারপর একদিন লেদু মিঞা-কে গুলি খেয়ে মরতে হল। অরণ্যের সাথে

সাথে বাঘেরও যেমন শেষ আশ্রয় নষ্ট হয়ে যায়, এই সমাজে লেদু মিঞারাও তেমনি আশ্রয় হারিয়ে ফেলেছে।[১০৭]

উত্তরবঙ্গ তাঁর উপন্যাসে এত প্রাধান্য পাওয়ায় তাঁর উপন্যাসগুলিতে আঞ্চলিকতার সুর অনেকটাই বিদ্যমান। 'বিকল্প' পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে অমিয়ভূষণ মজুমদার বলেছিলেন ঃ

> ''মানুষের কথা বলতে গেলে তাকে মাটিতে দাঁড় করাতে হয়। এসব করতে গিয়ে নিজের চোখে দেখা মাটি, আকাশ, জল, গাছ আঁকা যত সহজ, অন্যের মুখে অপরিচিত সে সবের কথা শুনে আঁকা ততটা ভাল হয় না। সেজন্য হয়তো পদ্মা থেকে শুরু করে কাঞ্চনজঙ্ঘা এই ভূভাগ আমি বেশি এঁকেছি।''[১০৮]

তিনি বিশ্বাস করেন, তিনিও 'পার্ট অব দ্য ল্যান্ডস্কেপ' এবং এই 'ল্যান্ডস্কেপ'কে চিত্রায়িত করা তাঁর কর্তব্য। উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত 'ল্যান্ডস্কেপ' তাই তাঁর উপন্যাসে মুখ্য হয়ে ওঠে; যে 'ল্যান্ডস্কেপে' বহুরঙা মানুষের মিছিল। তাই এই প্রসঙ্গে ভাবতে গেলে তুলনায় চলে আসে অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম', সমরেশ বসু-র 'গঙ্গা', প্রফুল্ল রায়-এর 'কেয়া পাতার নৌকো', শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কুবেরের বিষয়আশয়', দেবেশ রায়-এর 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', এমনকি বিদেশি সাহিত্যের শোলোকভ-এর 'অ্যান্ড কোয়াইট ফ্লোজ দ্য ডন', আঁদ্রে মালরো-র 'স্টর্ম ইন সাংহাই', ইউলিয়াম হেনরি হার্ডসন-এর 'গ্রীন ম্যানসন্স' ইত্যাদি উপন্যাসের নাম। অঞ্চলকে কেন্দ্র করে অমিয়ভূষণ অদ্ভুত নিপুণতায় ছোট ছোট ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করেছেন, যা তাঁর স্বকীয়তা।

'মাকচক হরিণ' উপন্যাসটি উত্তরবঙ্গের একটি জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক সঙ্কটের শিল্পায়ন। অস্বাভাবিকভাবে আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি নিজস্ব ঐতিহ্য কিভাবে বিলোদের পথে তা তুলে ধরেছেন অমিয় ভূষণ। রাভা থেকে মুসলমান হয়ে যাওয়া বমভোলা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে, দেশ বিভাগের পর পূর্ব বাংলার হিন্দু এবং মুসলমানেরা অসম এবং উত্তরবাংলায় নিজেদের বসতি স্থাপন করেছে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তারা স্ব-জাতীয় বলে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। কিন্তু বহু বছর ধরে এদেশে বসবাস করলেও রাভারা স্ব-জাতি বলে

এখানে গৃহীত হয়নি। উত্তরবঙ্গের একটি গাঁয়ের এই পরিবর্তনশীলতায় বিক্ষত ভূগোল ধরেই শ্যামচাঁদ আর বমভোলার ভাবনাকে অবলম্বন করেই অমিয়ভূষণ তুলে আনেন রাভা আর কোচ জনগোষ্ঠীর পুরাতত্ত্ব আর সামগ্রিক সঙ্কটের আয়তন। এই সঙ্কটের এক রূপ নিজের ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে দীক্ষিত হওয়া। রাভাদের কাউকে দেখা যায় খ্রীষ্টান হতে, কেউ বা হিন্দু ধর্মে রূপান্তরিত। ষাট বছর আগে যে রাভারা হিন্দু হয়েছিল তারা এখন ভাবে -

> ''তো হিন্দু হওয়া একই কথা। বাড়িঘর পরিস্কার রাখা লাগবে। বাড়ির নিচুতলায় শূকর রাখা না যাইবে, আর চকোত মদ খাওয়া না যাইবে, আর কৃষ্ণক পূজা করা লাইগবে।''[১০৯]

রাভা সমাজে মেয়েরাই জমির মালিক হয়, কিন্তু সমাজে তা না।

> ''শূকরগুলোকে খেদিখেদি করি বনত ছাড়ি দেওয়া হোল্। কেউ বা মেথরদের কাছে বেচি দিল। ... কিন্তুক মুশকিল করিল চকোত আর বিবাহ। চকোত মদ সহজে ছাড়া যায় না। ... আর বিবাহ ... আগে তো রাভার বেটি ছাওয়া জমির মালিক হইছে। বর জুটি গেইছে। এলা হিন্দু হওয়ার বাদে জমির মালিক তো ব্যাটা ছাওয়া।''[১১০]

এই উপন্যাসে আমরা দেখি, উত্তরবঙ্গের রাভাদের গরীব অংশ কীভাবে আরো গরীব হয়ে যাচ্ছে, ধনী রাভারাও ধানের জমি খুইয়ে কীভাবে গরীব হয়ে যায়, কীভাবে নিজেদের ভাষা অন্য ভাষার প্রভাবে সঙ্কটের মুখে দাঁড়ায়।

অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর উপন্যাসের চরিত্রদের দিয়েছেন উত্তরবাংলার জনগোষ্ঠীর ভাষা। কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ঃ

১) ভাবলং তোমাক ধরি বনৎ যাং, পাখি ধরিম্। (দুখিয়ার কুঠি)

২) মুই যাং এলা (তদেব)

৩) মুই যেদুনা ফিরির পাং তো ওই জমি আসফাকের থাকি যাইবে। (মহিষকুড়ার উপকথা)

৪) অও দেমাক না দেখাইস। নছিব, ত্যাও যদি খ্যামতা থাকিল হয়। (তদেব)

৪) আইজ তো তোমরা আছ, তা আমি ঘরত যাই কি কও। আর কাঁয় থাকে খামারত? (তদেব)

৫) তোমরা সন্নেসি হলং তোমরা জানির পার। মুই নাই জানং, আজি মোর

চোখুর আগৎ এক পাক ঘুরি গেইছে। কাল ফিনযাঙ, ভাল করিয়া দেখকাল। (এই অরণ্য এই নদী এই দেশ)

৬) লাম্বা ভারী শরীরের নাকের নিচে অলপ্ অলপ্ গোঁফ। (তুলাইপাঞ্জার রোয়া)

৭) বমবলা বলল, না হয়রে, উম্রারই সাল ধান ভাল হইছে। আর অর নাকি লাগাইছে। এলা না ধান কাটে। কোটে আর যার নবদ্বীপ? তো যাও যাও, বাচ্চা এলা ঘরৎ যাও। হোই না দেখ। (বিনদনি)

৮) দেখেক কুমর, এলা মুই শিয়ানা হইছং। (দুখিয়ার কুঠি)

৯) মঙুলারে ক'লাম, মুঙলারে, হার। খুব হার খালাম। মুঙলা কয়, কস্ কি? মুঙলা যেন বসে বসে লাফায় কচ কচ কচ। আলেফ সেখ আলে দাঁড়ায়ে দাড়ি ভাসায়ে গদগদায়ে হাসে আর কয়, ... সাবিসি বেটা, সাবিসি।'

১০) পিরহান পিন্ধি আসেন তোমরা। (মহিষকুড়ার উপকথা)

১১) আসফাক ব্যাপারির এক গাবতান ভৈষী ধরি না পালান কেনে?' (তদেব)

ব্যবহার ররেছেন আদিবাসী শব্দ, বাক্য। 'তুলাই পাঞ্জার রোয়া' উপন্যাসের থেকে দৃষ্টান্ত নেওয়া যায়ঃ

১) কোচানি কানাইঙি গাবজ হাইলাদি (কোচদের গায়ের রঙ হলুদ)

২) রাক্রাংনি সাবজ হিঞ্জলিং (আকাশের রঙ নীল)

৩) নাইং পেনে মিচিক (তুমি সুন্দরী নারী)

'বারোমাস' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেয়েছিল অমিয়ভূষণের উপন্যাস 'তাসিলার মেয়র'। এই উপন্যাসটি উত্তরবঙ্গের জয়ন্তী-বক্সাদুয়ার অঞ্চলের পটভূমিকায় রচিত। তিনি তাঁর নিজস্ব ধরণে সজীব করে তুলে ধরেছেন অরণ্যঅধ্যুষিত জলপাইগুড়ি জেলার এই পাহাড়ি অঞ্চলকে। উপন্যাসে অমিয়ভূষণ 'তাসিলা' বলে যে অঞ্চলকে কাল্পনিক নামে আখ্যায়িত করেছেন তা আসলে জয়ন্তী-বক্সাদুয়ার অঞ্চল। কিছু বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারেঃ

> ১) তাসিলা জং অথবা অথবা সংক্ষেপে তাসিলাকে শহরই বলতে হবে। তাসিলা নামে পাহাড়ের উপরে এক সময়ে জং অর্থাৎ দুর্গ ছিল। ভঙ্গুর চুনাপাথরের একটা ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখা যায়। সম্ভবত এটা কোনো

গিরিপথের সঙ্গে যুক্ত যে পথে তাসি নামা কেউ কখনো অভিযান করে থাকবে। শহরের উচ্চতা আড়াই থেকে তিন হাজার ফিট, লোকসংখ্যা দেড় হাজার। একে শহর বলার এই যুক্তি যে গ্রাম বলতে আমাদের মনে যে চাষের জমি, কৃষক, কুটির ইত্যাদি ভেসে ওঠে তা এখানে কোথাও নেই। [১১১]

২) তাসিলা এক পাশপোর্ট সাইজ পাহাড়ি শহর যার উচ্চতা আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার ফিট। আর খানিকটা উঁচু হলে হিল স্টেশন হতে পারত। ... শহরটা গড়ে উঠেছিল সীমান্তের এক দুর্গকে অবলম্বন করে, তার প্রমাণ রূপে চুনাপাথরের তৈরি এক দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং বাজারের পাশে এক চত্বরে কিছু ধ্বংসোন্মুখ সমাধি চোখে পড়ে। সেই গৌরবের যুগে নাকি গ্যাসের আলো জ্বলত, মেমসাহেবদের নিয়ে ডান্ডি, কান্ডি, রিক্সা চলত তাসিলার আঁকাবাঁকা উঁচু নিচু পথে। সেই যুগের অবসানে দুর্গ স্থানান্তরিত হয়েছিল ভয়ঙ্কর অপরাধীদের জন্য দ্বিতীয় সেলুলার জেলে, ফলে আর্মির স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল জেলার, আর্মড পুলিশ ইত্যাদি। তৃতীয় পর্যায়ের দুই স্তর। প্রথম স্তরে এই শহরে ফরেস্ট ডিভিশনের হেড-কোয়ার্টার ছিল, ব্রিটিশ ডি.এফ.ও ছিল। ... দ্বিতীয় স্তরে এটা রেঞ্জ হেড-কোয়ার্টার।[১১২]

এই উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে উঠেছে বক্সাদুয়ার এলাকার পাহাড়ি মানুষজনের আচার-আচরণ, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি।

এই বিস্তৃত আলোচনার প্রান্তে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি - তাঁর নানান উপন্যাসে উত্তরবঙ্গ নানানভাবে এসেছে। 'বিনদনি' উপন্যাসে কামাখ্যাগুড়ি, তুফানগঞ্জ, হরিরহাট ও গোয়ালপাড়ার বিস্তীর্ণ এলাকা, 'হলং মানসাই উপকথা'-তে মাথাভাঙ্গা, হিন্দুস্থান মোড়, ফালাকাটা অঞ্চল, 'সোঁদাল'-এ দিনহাটা, তোর্ষার চর ও গোসানিমারি অঞ্চল, 'তালোর মেয়র'-এ জয়ন্তী-বক্সাদুয়ার, 'তুলাইপাঞ্জার রোয়া'-তে ধূপগুড়ি এলাকা, 'মাকচক হরিণ'-এ তুফানগঞ্জ, কোকড়াঝাড় সীমান্ত অঞ্চল, 'পুকুরের মুক্তো' উপন্যাসে কালিম্পং অঞ্চল ধরা পড়েছে বৈচিত্র্যময় ব্যাপ্তিতে।

পরিশেষে অমিয়ভূষণ মজুমদার-এর নিজস্ব অনুভূতি উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

''উত্তরবঙ্গের উত্তরখন্ডে আমার বাস। কোচবিহার প্রতির কথা আগেই জানিয়েছি। এই টেমপারেট জোন-এর সুন্দর শহর যাকে আমরা স্বাধীনতা

প্রাপ্তির ত্রিশ বছরে নোংরা আর ঘিঞ্জি করে ফেললেও যথেষ্ট খারাপ করতে পারিনি। এই টেমপারেট জোন-এর সুখ-সুবিধা, আরাম, উত্তরবঙ্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব তৈরি করেছে। কিন্তু আসলে আমি জানি আমার মা যে জেলের মেয়ে, তোমরা নিষাদ, শবর, পুলিন্দ বলবে কিনা ভেবে দেখো, বা শান্তনুর স্ত্রী সত্যবতীর বোন, তাকে রুগ্ন ছেলেমেয়ের জন্য কলকাতার এক হাঁটু কাদায় গেঁড়িগুগলি তুলতে হয় বটে, কিন্তু তার কপালে সে-সময়েই কাঞ্চনজঙ্ঘা হীরার মুকুট। ডায়মন্ডহারবারকে সুন্দরবনকেও নিশ্চয় ভালবাসি। কিন্তু এই বয়সে সেখানকার রাগ-রাগ ক্লাইমেট আমার সহ্য হবে না। আসলে আমার বিশ্বাস কলকাতা নামক ঔপনিবেশিক শহর ও কনজুমার গুডসের আড়তের বাইরে মেদিনীপুর থেকে বীরভূম, পুরুলিয়া থেকে নদীয়া সীমান্ত, উলুবেড়ের উত্তর থেকে লিকিম সীমান্তে ছড়ানো কলকাতার বাইরের যে-ভূমি যাকে তোমরা গ্রামবাংলা বলো (কেন যে বলো? কোন সমাস এটা? কী কুৎসিৎ শব্দ!) যাকে প্রকৃতপক্ষে হিন্টারল্যান্ড ভাবা হয়, যেখানে দলদলে কাদায় পা পুঁতে দাঁড়িয়ে, ভালুক-ভালুক চেহারার কালো-কালো কৃষকেরা ঔপনিবেশিক শহরের অন্ন তৈরি করে, তথাকথিত শ্রমিকদের ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সর জোগান ঠিক রাখে, যে-ভূমিতে নীল বিদ্রোহ, চাষী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, যে-ভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবস্থান পাতেন, সেই ভূমি যা কলকাতার চাইতে অনেক অনেক বড়ো, সেখানে বাঙালিদের দশ ভাগের সাত ভাগ থাকে, সেই আমাদের মাতৃভূমি, তা বকখালি হোক, শুকনা হোক, কিংবা অযোধ্যা পাহাড়ের গাঁ। কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাচ্ছি না। কলকাতাকে বলতে চাইছি বেরিয়ে এসো ইংরেজিআনা থেকে - দ্যাখো এই মাতৃভূমি, ভালোবাসো একে, মরবে না। কাদায় ডুবে যাচ্ছে, ধোঁয়ায় দমবন্ধ, কতদিন আর অ্যাংলো-স্যাক্সনি-মুখোসে থাকবে?"[১১৩]

অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর উপন্যাসের পাতায় পাতায় অসামান্য শৈল্পিক সুষমায় দেশজ গন্ধমাখা মৃত্তিকাময় উত্তরবাংলাকে তুলে ধরেছেন বারবার।

উল্লেখপঞ্জী

১) অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ১ম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২ পৃ-১৪

২) তদেব, পৃ-১০

৩) 'লাল নক্ষত্র' আশ্বিন-১৩৯৩ সংখ্যা ১৮৭-১৮৮

৪) অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ১ম খন্ড,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২, পৃ-১৩

৫) অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ১ম খন্ড,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২, পৃ-১২

৬) তদেব, পৃ-১২

৭) তদেব, পৃ-১৩

৮) তদেব, পৃ-১২

৯) তদেব, পৃ-১২

১০) 'লাল নক্ষত্র' আশ্বিন-১৩৯৩ সংখ্যা ১৮৯

১১) অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ১ম খন্ড,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২, পৃ-১৩

১২) অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ১ম খন্ড,দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২, পৃ-১৪

১৩) 'লাল নক্ষত্র' আশ্বিন-১৩৯৩ সংখ্যা ১৯০

১৪) 'লাল নক্ষত্র' আশ্বিন-১৩৯৩ সংখ্যা ১৮৬

১৫) অমিয়ভূষণের কথাসাহিত্য ঃ আখ্যানের ব্যতিক্রমী শিল্পরূপ/অর্জুন চন্দ্র দেবনাথ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ১৮

১৬) 'লাল নক্ষত্র' আশ্বিন-১৩৯৩ সংখ্যা ১৯৪

১৭) বিকল্প-৬, সেপ্টেম্বর, ২০০১, পৃ-১১

১৮) অমিয়ভূষণের কথাসাহিত্য ঃ আখ্যানের ব্যতিক্রমী শিল্পরূপ/অর্জুন চন্দ্র দেবনাথ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, ২০০৫, পৃষ্ঠা - ১৬৫

১৯) স্বতন্ত্র নির্মিতিঃ অমিয়ভূষণের সাহিত্য/রমাপ্রসাদ নাগ/পৃ ঃ ১৫৬-১৫৭

২০) বাংলার কবি ও লেখক, প্রমথনাথ বিশী, করুণা প্রকাশনী, পৃ-২৭
২১) জীবন পিপাসার মহাকাব্য ঃ গড় শ্রীখন্ড/শ্যামল রায়, পৃষ্ঠা ৪-৮
২২) অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র ২য় খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৩, পৃ-১৭
২৩) সাক্ষাৎকার, দৈনিক বসুমতী, ১৬.০১.১৯৯৪
২৪) গড় শ্রীখন্ড, অমিয়ভূষণ মজুমদার, অরুণা প্রকাশণী/পৃষ্ঠা-১৫৮
২৫) উপন্যাসের রূপরেখা/অর্ণব সেন, পৃষ্ঠা-৬
২৬) সাক্ষাৎকার/১ বিষয় লেখক পাঠক সম্পর্ক, ভাষা ফর্ম
২৭) সাক্ষাৎকার ঃ লেখক পাঠক সম্পর্ক ভাষা ফর্ম/১
২৮) স্বতন্দ্র নির্মিতি/রমাপ্রসাদ নাগ, পৃষ্ঠা-১৪১
২৯) গড় শ্রীখন্ড, অমিয়ভূষণ মজুমদার, অরুণা প্রকাশণী/পৃষ্ঠা-১৬৩
৩০)তদেব/পৃষ্ঠা-১৭০
৩১) তদেব/পৃষ্ঠা-২৯৪-২৯৫
৩২) তদেব /পৃষ্ঠা-২৩৯
৩৩) তদেব/পৃষ্ঠা-৫১১
৩৪) তদেব/পৃষ্ঠা-৭৭
৩৫) গড় শ্রীখন্ড, অমিয়ভূষণ মজুমদার, অরুণা প্রকাশণী/পৃষ্ঠা-৯৯-১০০
৩৬) অমিয়ভূষণের কথাসাহিত্য/অর্জুন দেবনাথ পৃষ্ঠা-২৭৩
৩৭) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ-৮৬
৩৮) গড় শ্রীখন্ড, অমিয়ভূষণ মজুমদার, অরুণা প্রকাশণী/পৃষ্ঠা-১৪৩
৩৯) গড় শ্রীখন্ড,,অমিয়ভূষণ মজুমদার, অরুণা প্রকাশণী/পৃষ্ঠা-২৯
৪০) মহিষকুড়ার উপকথা, রক্তকরবী, কলকাতা-৯, পৃ-১৫
৪১) তদেব, পৃ-৫
৪২) তদেব, পৃ-৫
৪৩) তদেব, পৃ-৮
৪৪) তদেব, পৃ-২৯
৪৫) তদেব, পৃ-২৯
৪৬) তদেব, পৃ-৩৫
৪৭) তদেব, পৃ-৫৫

৪৮) মহিষকুড়ার উপকথা, রক্তকরবী, কলকাতা-৯, পৃ-৬৭

৪৯) তদেব, পৃ-৬৩

৫০) তদেব, পৃ-১

৫১)তদেব, পৃ-৫

৫২) তদেব, পৃ-১০

৫৩) তদেব, পৃ-১৮

৫৪) তদেব, পৃ-৪৫

৫৫) তদেব, পৃ-৫৩

৫৬) তদেব, পৃ-২

৫৭) তদেব, পৃ-৫

৫৮) তদেব, পৃ-১৯

৫৯)তদেব, পৃ-২৯০

৬০)তদেব, পৃ-১৫৬

৬১) আজকাল/১৬.১২.৮৬/সুব্রত সেনগুপ্ত

৬২) মহিষকুড়ার উপকথা, রক্তকরবী, কলকাতা-৯, ২০০০, পৃ-২৮২

৬৩) দুখিয়ার কুঠি/ অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৬, এপ্রিল-১৯৮৯, পৃঃ ১০১

৬৪) অমিয়ভূষণের কথাসাহিত্য/অর্জুন দেবনাথ , আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, ২০০৫, পৃঃ ২০৪

৬৫) দুখিয়ার কুঠি, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৬, এপ্রিল-১৯৮৯, ভূমিকাংশ

৬৬) প্রসঙ্গ ঃ অমিয়ভূষণ, নিঃসঙ্গ মানুষের পথচলা ও উত্তরণ/রমাপ্রসাদ নাগ/বৈতানিক, অমিয়ভূষণ সংখ্যা, পৃ-২৭

৬৭) এই অরণ্য, এই নদী, এই দেশ/শিবনারায়ণ রায়/জিজ্ঞাসা, একাদশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৯৭

৬৮) হলং মানসাই উপকথা/পৃষ্ঠা-৭

৬৯) তদেব/পৃষ্ঠা-১১

৭০) তদেব/পৃষ্ঠা-২১

৭১) তদেব/পৃষ্ঠা-২২

৭২) হলং মানসাই উপকথা/পৃষ্ঠা-৬০

৭৩) প্রসঙ্গ ঃ অমিয়ভূষণ, নিঃসঙ্গ মানুষের পথচলা ও উত্তরণ/রমাপ্রসাদ নাগ/বৈতানিক, অমিয়ভূষণ সংখ্যা, পৃ-২৮

৭৪) সোঁদাল/পৃ-৯১

৭৫) তদেব/পৃ-৯৩

৭৬) তদেব/পৃ-১০৩

৭৭) তদেব/পৃ-১১২

৭৮) মধু সাধু খাঁ, অমিয়ভূষণ মজুমদার, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৫, বাণীশিল্প, কলকাতা/পৃ-৭

৭৯) তদেব/পৃ-১২

৮০)তদেব/পৃ-১৬

৮১) তদেব/পৃ-২৩

৮২) তদেব/পৃ-৩২

৮৩) তদেব/পৃ-৩৭

৮৪) তদেব/পৃ-৪৩

৮৫) তদেব/পৃ-৫৫

৮৬) তদেব/পৃ-৬৩

৮৭) তদেব/পৃ-৩৩-৩৪

৮৮) তদেব/পৃ-৩৮-৩৯

৮৯) তদেব/পৃ-৭০

৯০) তদেব/পৃ-৭২

৯১) তদেব/পৃ-৭৩

৯২) তদেব/পৃ-৭৪

৯৩) তদেব/পৃ-১৯

৯৪) তদেব/পৃ-২০

৯৫) তদেব/পৃ-২৩

৯৬) তদেব/পৃ-২৫

৯৭) তদেব/পৃ-২৬

৯৮) মধু সাধু খাঁ, অমিয়ভূষণ মজুমদার, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৫, বাণীশিল্প, কলকাতা/পৃ-২৮

৯৯) তদেব/পৃ-৩০

১০০) তদেব/পৃ-৩০

১০১) তদেব/পৃ-৩১

১০২) তদেব/পৃ-৩২

১০৩) তদেব/পৃ-৩৪

১০৪) তদেব/পৃ-৩৫

১০৫) মধু সাধু খাঁ, অমিয়ভূষণ মজুমদার, প্রথম প্রকাশ ১৩৭৫, বাণীশিল্প, কলকাতা/পৃ-৩৫

১০৬) জীবনানন্দ দাশ/শ্রেষ্ঠ কবিতা/ভারবি, কলকাতা/১৯৮৮/পৃঃ-১৩৫

১০৭) অমিয়ভূষণের কথাসাহিত্য ঃ আখ্যানের ব্যতিক্রমী শিল্পরূপ/অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ/আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, ২০০৫, পৃঃ ৮০-৮২

১০৮) বিকল্প/৬.৯.২০০১

১০৯) মাকচক হরিণ/শারদীয় দৈনিক বসুমতী, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃ- ১৮

১১০) তদেব, পৃ-২১

১১১) তাসিলার মেয়র, অমিয়ভূষণ মজুমদার, বারোমাসা, কলকাতা, ১৩৮০/পৃ-১৪

১১২) তদেব/পৃ-৫২

১১৩) অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র ১, নিজের কথা, অমিয়ভূষণ মজুমদার/দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২/পৃ-১৮